প্রকাশক

শ্রীমনোজকুমার বসু, কথামালা প্রকাশনী

১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান

নিউ সরস্বতী প্রেস

১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদচিত্র। সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম :: দু' টাকা।

উৎসর্গ

শ্রীবিমল কর

প্রীতিভাজনেষু—

এই লেখকের অন্যান্য বই

উন্মেষ

ঘূর্ণি হাওয়া

মানসলতা

মায়ের গান

সূচীপত্র

অরণ্য

নির্মেঘ আকাশ। শরতের জ্যোৎস্না সাদা রাত।

রাত গাঢ় হয়নি। এইমাত্র ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজলো। কলকাতার জনবহুল রাস্তা এখনো সরব। পথচলা লোকের গুঞ্জন আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-মোটরের শব্দ দিনের চেয়ে আরো সুস্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে।

জলি উল-কাঁটা নিয়ে বসেছে। সোয়েটার তৈরী করছে স্মার্লি এর জন্যে। শীত উঁকি মারছে পাহাড় থেকে। শীতের আগেই যে করে হোক শেষ করতে হবে। এর পরে তো আর ফুরসত পাবে না; নিশ্চয়ই কাজের অন্ত থাকবে না তার তখন। কয়েকটা ঘর বুনতে না বুনতেই কেমন অস্বস্তি বোধ করল সে। অসমাপ্ত সোয়েটার উল-কাঁটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। আজ থাক। আর কতটুকুই বা কাজ আছে? কাল-পরশু যে কোন একদিন ঘণ্টা তিনেক বসে সেলাই করলেই শেষ হয়ে যাবে। শুধু গলাটাই না তুলতে বাকি?

একখানা বই নিয়ে দক্ষিণ কোণের ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে পড়তে লাগলো। বেশ খোলামেলা ঘর। অফুরন্ত আলো-বাতাস। কোন বাহুল্য নেই ঘরে। আছে শুধু বাছাইকরা কয়েকটি মনোরম শৌখিন জিনিস। একটা বড় হাতীর দাঁত, তার পায়ের একটা বসবার আসন, বাঘের চামড়া একটা, বড় আয়না একখানা আর একটা বেডসাইড টেবিল। টেবিলের ওপরে পিতলের ফুলদানিতে কিছু ফুল পাতা।

হাতীর দাঁত, তার পায়ের আসন আর বাঘের চামড়া এই তিনটে জিনিস জলিই এদের দিয়েছে। গত বছর স্মার্লিং একটা হাতী মেরেছিল। বেশ বড়। মাকনা। দুটো বড় দাঁত ছিল তার। তারই একটা এই। অন্যটি নিজেরা রেখেছে। পা তিনটি রেখেছে তারা, আর একটা এই। বাঘ-হরিণ তো অনেক শিকার করেছে স্মার্লিং। চামড়াও প্রচুর আছে ওদের। তাই রয়েল বেঙ্গলের একটা ভাল ডোরা চামড়া দিয়েছে আন্টিকে।

এ বাড়িতে জলি এসেছে আজ চারদিন। বাড়িটা তার অ্যাণ্ট মিসেস ওয়াটসনের। যে ঘরটিতে সবচেয়ে বেশি আলোবাতাস খেলে, সেইটিই তিনি তাকে দিয়েছেন। কলকাতার এই অসহ্য গরম যে জলির সহ্য হবে না তা তিনি ভালোই জানেন। ও থাকে বরফের দেশের কাছাকাছি। বরফগলা হিমেল হাওয়া বয় সেখানে। তারপর যে-বাড়ি আর যে-ঘরে সে থাকে এই বাড়ি, এই ঘর, সে তুলনায় একটা পায়রার খুপরি বৈ আর কিছু না। ক'দিনই বা থাকবে জলি? দশ-বারো দিন, না হয় দু'হপ্তা বড়ো জোর! দু'চার দশদিন একটু অসুবিধা হলে তেমন কি এসে যায়? ওদের ওখানে গেলে ওরা কতো যত্ন করে। আর ওরা তো অনাদরের পাত্র নয়। ভাইয়ের ছেলে আর তার বউ।

এই সঙ্কীর্ণ অপ্রচুরতার মধ্যে জলি যেন নিজেকে সংযত রাখতে পারে না সময়ে সময়ে। অস্থির, বিব্রত হয়ে ওঠে। হাঁপিয়ে ওঠে। অবশ্য সময় সময় সব ভুলে যায় যখন সে ঐ দক্ষিণের ঘরটিতে বসে বাইরের মনোরম পার্কটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সতৃষ্ণ নয়নে, উদ্‌ভ্রান্ত মনে

চেয়ে থাকে জানালা দিয়ে। মনে বিস্মৃতপ্রায় কত রোদের ঝলসানি ভেসে ওঠে। টের পায় না কোনখান দিয়ে সময় কেটে যায়। চেতনা থাকে না।

মিসেস ওয়াটসন চতুরা। তাঁর চোখ আড়াল করে জলির মতো একটি সরল প্রগলভা যুবতীর পক্ষে সঙ্কোচ ভাব ঢেকে চলা একান্ত অসম্ভব। বয়স তেমন কিছু বেশি না হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। নিজে বর্ণচোরা, কিন্তু অপরের মনের রঙ কেড়ে নেওয়া তাঁর কাছে অসহজ নয়। বারো বছরে তিন দফা হাত-বদলই তাঁর এই অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। জলির মনটাকে সরস সতেজ রাখার জন্য তিনি রোজ বিকেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যান; নতুন নতুন জায়গায় নব নব পরিবেশে। পরিচয় করিয়ে দেন কতো বিচিত্র ভাবভঙ্গির লোকের সঙ্গে। এটা-ওটা দেখান—বলেন—বুঝিয়ে দেন। কবে যুদ্ধের সময় কোথায় বোমা পড়েছিল? কী ক্ষতি ও দুর্দশা হয়েছিল এই কলকাতাবাসীদের। কী করে লোকগুলো পালাতে লাগলো বোমার ভয়ে! কী বীভৎস হাহাকার! দেখে হাসি পেত। কী ভীরু এই বাঙলাদেশের লোকগুলো? এইসব দেখাতেন, আর এমন চোখে তাকাতেন, যেন বলছেন—জলি, কী বলবো তোকে একবার যদি দেখতে পারতিস—। তারপর ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে হো হো করে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠতেন মিসেস ওয়াটসন।

জলি ম্লান চোখে অসহায় ভাবে চাইত আন্টির দিকে। ভাল লাগে না তার ঐ হৃদয়হীন নির্মম হাসি। রাগ করে মনে মনে। ভাবে, এ দেশের লোকগুলো তো আর যুদ্ধ দেখেনি

কোনদিন। এরা শান্তিপ্রিয়। এদের পক্ষে ভয় পাওয়াটা এমন কি আশ্চর্যের? এতে হাসির কি আছে? নিজের বিপদে কি কেউ এমন করে হাসতে পারে? এই তো কতো বড় বড় ডাক্তারকে দেখতে পাই—ঘাবড়ে যেতে ওদের ছেলেমেয়ে স্ত্রীর অসুখে? এ আন্টির বড়ো অন্যায়। এতে দোষের কি আছে ভেবে পায় না জলি।

আজও ওরা রোজকার মত বেশ খানিকটা বেড়িয়ে এল বড় সড়ক ধরে। সড়কের ধারেই কবরখানা। জোৎস্নার ফুলঝুরি জ্বলছে যেন কবরের পাথরে। মনে হয় হাসছে। স্নিগ্ধতা নেই সে হাসিতে। প্রচণ্ড উগ্রতা। মনে হয়, চাপা এক আঁচের হলকা বেরুচ্ছে কবরের মুখ দিয়ে।

থমকে দাঁড়ালো জলি। নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে গোরস্থানের ঘাসের ঠাণ্ডা বাতাস আচমকা যেন ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিল। অদ্ভুত সে স্পর্শ। অনুভবের সঙ্গে কেমন অন্যমনস্কতা এবং ভয়। মুহূর্তে যেন বরফ হয়ে গেল।

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তবে বিচ্ছেদ কেন? ফেরার পথে জলি অজ্ঞাতেই কেমন দার্শনিক হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে দেখতে পেল যৌবনের কতো কল্পনা-রঙীন আশা-আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে যাচ্ছে এক অব্যক্ত নিরাশার অন্ধকারে। মনটা বিষিয়ে উঠলো মুহূর্তে। কঠোর বাস্তবের একটা যাঁতা ঘুরছে মনে। একে যেন মেনে নিতেই হবে। কেন, সে তো না মানলেও পারত। কেন, সে এলো এখানে? ওখানে থাকলেও তো চলতো? বাবুয়ানী, কুলি-কামিনরা তো বাগান ছেড়ে যায় না। তাদের কি ভয় নেই? ভয় কি শুধু ওদের? ইউরোপীয়ানদের? আশ্চর্য, এ ব্যাপারে

এদেশের পুরুষদের এ জন্যে কোন ভয়-ভাবনা নেই। তারা স্বচ্ছন্দ, সুস্থির। ভাবনা কেবল আমাদের সমাজের পুরুষদের? মনটা তিতিয়ে উঠলো স্বার্লিংএর ওপর। স্থির করল জলি—আর কখনো একা একা আসবে না সে।

আজ এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ মনে করছিল জলি। হাতের বইখানা কখন যে অলক্ষ্যে বন্ধ করে নিঃসাড়ে বুকের ওপর রেখেছে খেয়াল নেই। নিবিষ্ট মনে কতো কি ভাবছে। চা-বাগানের বনের সেই হিংস্রতা! বাঘ-ভালুক-হাতী আর শুয়োরের বন্যতা। তাদের সেই রাগত-রক্তচক্ষু। অন্যমনস্ক মনের অন্ধকারে এরা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছিল। আর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল জলি।

জানালা খোলা ছিল ঘরের। চকিতে নজর পড়লো পার্কের বর্ণালি পাতাবাহারের গাছে। হালকা হাওয়ার নরম স্পর্শে নববধূর মতো আহ্লাদে নুয়ে পড়েছে তারা। শিউলী ফুটেছে। শাদা শরীর। বুকে লাল দাগ। দু'এক ফোঁটা সদ্যঝরা শিশিরের সিক্ততা শিউলীগুলোকে বড়ো সুন্দর করে তুলেছে। কখন বাতাস এসে নাড়া দিল। একটি দুটি করে করে ক'টি ফুল ঝরে পড়ল।

আস্তে আস্তে রাত ঘনিয়েছে। ধীরে ধীরে পার্ক জনহীন। বিক্ষিপ্ত দু-চারটে লোক ছাড়া সবই প্রায় ফাঁকা। পাতা-বাহারের দুটো ঝাড় অস্বাভাবিকভাবে দুলে উঠলো। জলি চকিত বিস্ময়ে চেয়ে আছে সেদিকে। দেখতে পেল না কিছুই। মনে করলো হয়তো কোন কুকুর হবে। পরক্ষণেই ভুল ভেঙে গেল। চোখে যা দেখতে পেলো

তাতে এইরকম একটা মোমগলা রাতের কথা তার মনকোঠরে ফেনিয়ে উঠলো।

সেদিনও এমনি করে আবেগ-বিহ্বল হয়ে উঠেছিল ছুটি দেহ। কেঁপে উঠেছিল ওদের চৈতন্য। সেই পরম মুহূর্তে পরস্পরকে চিনে নিল তারা। অনাস্বাদিত দেহে একটা নতুন অনুভূতি পেলো। তারপরই না আকর্ষণ—স্মার্লিংকে ভালোবাসা।

সেদিন থেকে যেন জীবনটা একটা নতুন রূপ নিল জলির। আর আজও তার সেই স্রোত বুঝি চলেছে অব্যাহত। মুহূর্তে জলির মনটা একটা রঙিন আলোয় রাঙিয়ে উঠলো। অনুভব করছিলো জীবনের সেই স্বাদ। নীরব ঠোঁটের কোণ ছুটিতে মঞ্জরির মতো হাসি লাগছিল।

কঠোর বাস্তব তাও সহজ-সরল রূপে ফিরে এলো। মনে জাগলো—তার নিজের ঘরবাড়ি সংসার। যেখানে তারা থাকে। মস্তবড় দোতলা বাঙলো। মাটি থেকে ঘরের মটকা অবধি লতিয়ে উঠেছে কতো দেশী-বিদেশী বিচিত্র লতা। কী অপূর্ব মনকাড়া সে ছবি। তাদের লঘু দেহের আর কচি সরল থলথলে মুখের তরল হাসি বাঙলোর দরজা-জানালাগুলোকে একটা অপরূপ মাধুর্যে ভরিয়ে রেখেছে। গ্রাউণ্ডফ্লোর সানবাঁধানো। আউটসাইড ওয়াল, ইনসাইড পার্টিশন, উপরতালার সমস্ত কাজই কাঠের। ছাউনি টিনের। চিনে মিস্ত্রীর হাতের কাজ। নিপুণ, নিখুঁত, নির্ভুল ও মসৃণ। কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি নেই। জানালা-দরজা দেওয়াল আকাশী-নীল রঙের। জলি এই রঙটি খুব পছন্দ করে। তার বেশির ভাগ গাউনের এই রঙ। এক রঙ না হলে কি

মনের মিল হয়? দুটো আলাদা রঙকে একসঙ্গে নিখুঁতভাবে মিশ খাওয়ানো যায় না। কোন না কোন জায়গায় একটু গলদ থাকবেই। শাদার সঙ্গে কি কালোর, হলুদের সঙ্গে কি পাটকেলে রঙের মিশ খায়? স্মার্লিংকেও সে তার রঙের সঙ্গে মিশ খাইয়ে নিয়েছে কতো 'অ্যাডজাস্ট' করে করে। সারা বাড়িতে কোথাও শিল্প-নৈপুণ্যের আতিশয্য কম নয়। মসৃণ গা দিয়ে যেন রঙ চুয়ে চুয়ে পড়ছে। আয়নার মত স্বচ্ছ। সম্পূর্ণ অবয়বটা জ্বল জ্বল করে ফুটে ওঠে প্রতিটি জিনিসের দেহের ভেতরে। যেন এক আত্মা, এক মন, এক দেহ। অনাদর নেই একটুকুও। দুজনেই দুজনকে ঢেকে রাখতে চায় বাইরের বিষাক্ত আবহাওয়ার হাত থেকে। তারপর সকালে বিকালে যখন সোনালী-রূপালী রোদ তার কোমল হাত বুলোয়, তখন ওরা বিস্ময় ও পুলকে চমকে ওঠে। চোখ ঝলসে যায় সে রূপের ঝলকে। নির্জন নিথর পুরীতে এই বাঙলো একেবারে পাহাড় ও বনের কোলে। সেখানে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। শুধু রাত্রে কানে আসে বন্যপশুর হিংস্র গর্জন, উন্মত্ততা, প্রমত্ততা। দিগন্তব্যাপী চায়ের চাষ। আর তার মধ্যে সারিবদ্ধ শিরিষ ও খাঁকড় গাছ।"

এই নিস্তব্ধতার ভেতরেও জলি অপার আনন্দ পেত; এখনও পায়। একটুও শঙ্কিত হয় না ঐ হিংস্র শ্বাপদকুলের বীভৎস চীৎকারে। এখানে সর্বত্রই যেন একটা নিরপত্তার প্রতিকূল আবহাওয়া। জীবনের অফুরন্ত স্বাদ যেন এই বিজন-পুরীর কঠিন পাথরের রাস্তাঘাটে, গাছপালায় লতাপাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে। দৈনন্দিনের অসংখ্য সূত্র ধরে

আসে নির্মম কঠোর বাস্তব। কিন্তু এদের রুদ্ধ শক্ত দুয়ারে এসে মাথা ঠুকে ফিরে যায় সব।

জলি ভাবে। তন্ময় হয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাঙলোর ছোট্ট 'কট্‌টা', ঘরের উত্তর কোণে যেন কেমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। বাঘের চামড়া ও হাতীর দাঁতটি কেমন আঁধারি মনে হয়। আঁধারে থাকতে কি কেউ ভালবাসে? প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কেঁদে ওঠে। পূবের ওই বড় পানিসাজের গাছটি কেটে ফেলতে হবে। ওতে কি কম আবর্জনা হয়? রোজ তো একটি কুলি-কামিন শুধু ওই আবর্জনাই পরিষ্কার করে। মরা-ঝরা-শুকনো পাতা চিকন-চিকণ ডালপালা কি কম পড়ে? এ ছাড়া যতো শালিক বক কাক চিলের আড্ডা। সকাল সন্ধ্যায় কি বিকট বিটকেলে কিচিরমিচির আওয়াজ করে। মনটাকে তিক্ত বিতিক্ত করে তোলে। নিরিবিলি বসে একটু মনের কথা ভাববো সে উপায় নেই। স্মার্লিং গুলি করে মেরে ফেলতে চায় সবগুলো। কিন্তু জলি তা পছন্দ করে না। যেন এক নিদারুণ নির্মমতা। মানুষের কাজ নয়। না' গাছটি কাটা হবে না। গাছটি কাটলে ও বেচারীরা কোথায় যাবে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে? ওরাও তো ঘর বেঁধে আছে! ওরাও একসঙ্গে থাকে! ওদেরও সন্তান সন্ততি হয়—কাচ্চাবাচ্চা আছে! মনে মনে একটু রহস্যের হাসি হাসে জলি! একটা নরম রোদের আঁচ অনুভব করে। তবে আলোবাতাসও তো চাই। সকাল-সন্ধ্যের আলোবাতাস না পেলে কি ঘরবাড়ি আসবাব পত্তরের রূপ ফোটে না ঘরের কলুষ যায়? স্বাস্থ্যই বা ভাল থাকবে কেন? যাক্‌, দু'একটা ডাল কেটে একটুখানি হালকা

করে দিলেই হবে। তার কাজও হবে, ওরাও থাকতে পারবে।

এখন মনে পড়ল কথাটা আবার। স্মার্লিং আয়া নিতে বলেছে একটা। এতে জলির কিন্তু ষোলো আনা অমত। সে বলে—হাত গুটিয়ে নুলোর মতো বসে থাকা তার পক্ষে অসহ্য। সে তা কোনদিনও পারেনি। এখনও পারবে না। আর ঐ আয়া বেটিটাকে বিশ্বাস কি? কী খাওয়াবে, কি পরাবে তারই বা ঠিকানা কি—? শেষে হয়ত দুদিন পরে দেখতে পাবে সুন্দর নিটোল দেহখানি শুকিয়ে চিমসে মেরে গেছে। অনেক ওষুধপত্তর করেও কূল পাবে না এরপর। আর, ছাই এমন জায়গা যে, ভালো ডাক্তারও নেই একজন। যত সমস্ত উঁছা আর কি! আর ভাল ডাক্তার আসবেই বা কেন এই সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এই জঙ্গলে এই অমানুষের দেশে?

চোখের সামনে এবার ভেসে উঠলো অন্য একটা রমণীয় ছবি। কতদিনের স্বপ্নলব্ধ সেই ছবি—কী তার বিচিত্র পরিবেশ! এ দৃশ্য অনেকদিন অনেকভাবে দেখেছে সে। এ যেন পুরোনো হয় না কোনদিন। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে নব নব রূপে আসে।

সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাগলা পাথরমোড়া সড়কে পেরম্বুলেটর ঠেলছে স্মার্লি। গতি সাবলীল, বিরামহীন। দৃষ্টি গাড়িটার দিকে। সারা মুখখানিতে একটা উজ্জ্বল চমকানি। বঙ্কিম ঠোঁটের কোণে হাসির বিজুরী। ভাবছে, কচি হাত দুটি নেড়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে তরল হাসি হেসে মনের ভাব প্রকাশ করার কী অদম্য প্রয়াস ওই শিশুর!

স্মার্লি একটা মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরে বাংলার উপরটাতে তাকালো। জলি উপরে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছিল।

স্মার্লিং একগাল হেসে বললে—এখানে চলে এসো দেখছ না কী সুন্দর হাত নেড়ে ডাকছে তোমায় টম্।

জলি হেসে প্রায় লাফিয়ে উঠলো বিছানা থেকে। কোলের ওপর থেকে বইটা ছিটকে পড়লো মেঝেতে। ওর চমকও ভাঙ্গলো সেই শব্দে। ততক্ষণে পা ঝুলিয়ে বিছানার উপরে উঠে বসেছে সে। আপন মনে প্রাণভরে হাসলো খানিকক্ষণ। পরক্ষণেই একটা বেদনা অনুভব করলো পেটে। ভীষণ ত্রস্ত হয়ে পড়লো। সজোরে ডাকলো—আন্টি!

মিসেস ওয়াটসন্ পাশের ঘরে বসে বিলাতী মেইল লিখছিলেন এয়ার লেটারে। জলির চিৎকার শুনে ঘরে এলেন। জলি তখন যন্ত্রণায় কাতর ও করুণ। ছটফট করছে ভীষণ। কথা ফুটছে না মুখে। ভীত চোখ, পাংশু মুখ। একবার মাত্র আন্টির দিকে চেয়ে বুকে পেটে হাত দিয়ে ইংগিত করলো।

কখন যে নার্সিং হোমে আনা হয়েছে জলিকে, তা টের পায়নি সে। সবই দেখছিল, সবই শুনেছিল কিন্তু তবু কেমন যেন সংজ্ঞাহারা। বুঝতে পারছিল মোটর করে তাকে আনা হলো নার্সিং হোমে, অনুভব করতে পারছিল ডাক্তার নার্সদের দৌড়াদৌড়ি, জুতোর দ্রুত শব্দ—তাও কানে যাচ্ছিল। ওষুধ ব্যাণ্ডেজ তুলো, ঠেলাগাড়ি।

কখন যে একটু চেতনা ফিরে পেয়েছে জলি জানে না। সিস্টার ফিডিংকাপে গরম দুধের সঙ্গে বুঝি একটু ব্রাণ্ডি মিশিয়ে খাইয়ে দিল।

চেয়ে থাকল জলি তার দিকে।

সিস্টার বললে—ভয় কিসের? অল্পক্ষণের মধ্যেই সেরে উঠবেন।

চোখ থেকে দু' এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আবার একবার কৃতজ্ঞতামাখা চোখে নার্সের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকলো অসাড়ে।

কতক্ষণ পরে সিস্টার এসে আবার কি একটা ওষুধ খাইয়ে দিল। ঘোলা ক্লান্ত চোখ আবার বুজলো জলি। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে দেখতে পেলো মিশমিশে কালো মেঘে আকাশ টই-টুম্বুর। চাঁদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা নিখোঁজ। একটা কদর্য নিস্তব্ধতা। হিংস্র পশুগুলোও মৌনী। একটুও বাতাস নেই। অসহ্য গা-জ্বালা গুমোট। মনে হলো এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে।

বৃষ্টি এলো বটে তবে মুষলধারে নয়, মৃদুমন্দ তালে। তাতে গুমোট আরো বাড়লো।

জলি ঘুমিয়েছে। চোখে ওষুধের ঘুম—মনে তন্দ্রা। অদ্ভুত তন্দ্রা। সব আছে—অথচ নেই। হঠাৎ মনে হল—সারা বাড়িটি কেঁপে উঠেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ি, সড়ক গাছপালা সব যেন তলিয়ে যাচ্ছে পাতালে। শালিক চিল কাক বক চিৎকার করে করে ঝাঁকে ঝাঁকে শূন্যে পাখা মেলে দিয়েছে। বনের জানোয়ারগুলো বিকট আর্তনাদ করে বেরিয়ে আসছে জঙ্গল থেকে। কী রাক্ষুসে চেহারা! হিংস্র চোখ। বিরাট হাঁ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কোথাও যেন কোন ঠাঁই নেই পালাবার। চারিদিক জলে জলময়। মাটি ফুঁড়েও জল উঠছে ভুড়ভুড় করে। ওদের চা-বাগানের সেই বাংলোটা তখনো মাথা

উঁচিয়ে জলের ওপরে ভাসছে। হু হু করে জল এসে ধাক্কা খাচ্ছে চালের টিনে। দুর্বার জল প্রতিহত হয়ে ফেঁপে উঠছে রাক্ষুসে রোষে। স্মার্লিং চালের ওপরে দাঁড়িয়ে। বাঘের চামড়াগুলো ভেসে চলেছে জলে, হাতীর পা আর দাঁতও। হঠাৎ চালের টিনে প্রতিহত জলের একটা নিদারুণ ঝাপটা গিয়ে লাগলো স্মার্লিং-এর গায়ে। টাল সামলাতে পারলে না স্মার্লিং। ছিটকে গিয়ে পড়লো সেই রোষায়িত জলের গহ্বরে।

এ আর সহ্য করতে পারছিল না জলি। নিমেষে কী এক আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে সেই বিক্ষুব্ধ ক্ষুধিত জলে।

......কি যেন একটা পড়ার শব্দ। সিস্টার ছুটে এল। অস্ফুট আর্তধ্বনি। হাসপাতালে একটা বিস্ময়কর চাঞ্চল্য। সকলের চোখেমুখে যেন কিছু আতঙ্ক কিছু কৌতূহলের ছাপ। শুধু চোখ চাওয়াচাওয়ি।

জলি গোঙাচ্ছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। সারাটা দেহ কাঠ। দাঁতে দাঁত যেন কামড়ে আছে।

পুরো দুদিন অজ্ঞান ছিল জলি। তারপর যখন চোখ মেললো—শরীরটাকে কেমন যেন হালকা মনে হলো। অথচ ভীষণ ক্লান্ত আর দুর্বল। কোথায় যেন একটা ভার ছিল, অস্বস্তি অথচ যা আনন্দ। পেটে হাত দিয়ে নার্সকে কি যেন বললো জলি।

নার্স ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করে চোখ ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে। শেষে কি একটা অস্ফুট শব্দ করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জলি বুঝতে পারলো। আগেই পেরেছিল। একটা

চাপা দীর্ঘশ্বাস নামল বুক ভেঙে। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো ও। জল জমতে লাগল চোখের কোণে।

পরের দিন আশা ও নৈরাশ্যের ভেতরে ঘনঘন সময়ের খবর জিজ্ঞাসা। এইতো আটটা বাজলো। চা আর এক টুকরো রুটি দিয়ে গেল। মাথার উপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে তখন। এক ঝিলিক সোনার রোদ হেসে উঠলো জলির চোখেমুখে। আবার দু'ঘন্টা না পেরুতেই আঁধার ঘনিয়ে এলো। এতো বেলা হলো তবু আসছেনা কেন? ন'টার আগেই তো তার আসার কথা। তবে কি আন্টি তাকে 'ওয়ার' করেনি?—না—না তা কি হতে পারে? মাথা ভার হয়ে এলো জলির। এলিয়ে পড়লো আবার বিছানায়।

আন্টি এলেন সাড়ে দশটায়।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলো জলি।

আন্টি মুখ নিচু করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

জলি বুঝতে পারলো সব। ঠিক আগেই বুঝেছিল। অনুভব করতে পারত মনের কোন এক গোপনতম কক্ষে। এ-রকমই হবে, এমনটি হতে পারে—কে যেন জলিকে বলত। না, ভুল, নিজেকেই নিজে আবার বলত জলি।

বুদ্ধি নয়, বিবেচনা নয়, প্রত্যাশিত দুর্যোগের প্রতীক্ষা নয় পূর্বজ্ঞান হয়তো। স্মার্লিং-এর পেশীর জোর আর মনের সাহসের কথা জলি বারবার জেনেছে। অনেক প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে স্মার্লিং—[illegible] অনেক বাঘিনী-ভালুক-বরাহের প্রাণ। রাতের অন্ধকারপটে ঝিলিক দিয়েছে স্মার্লিং-এর ঝকঝকে দাঁতের হাসি আর তার নির্মম বন্দুকের গুলি।

অরণ্যের ভাষাহীন বহু মাতৃত্বের একটা অবোধ্য অভিশাপ এই আর্তনাদ তুলে মিলিয়ে গেছে। আর তারপর শিকার থেকে ফিরে অন্ধকার-প্রত্যুষে জলির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে এক ঘাতক অরণ্যের সেই অভিশাপ কণা।

তবু দৈহিক সম্মোহের মধ্যে তলিয়ে যেতে ভালো লেগেছে জলির। নদী যেমন সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যায় তেমনি। তলিয়ে যেতে যেতেও মাঝে মাঝে মাথা তুলে কি যেন বলতে চেয়েছে জলি। স্মার্লিং শোনেনি। শুনতে সে চায় না। জলির ঠোঁটের কথা আবার ফিরে গেছে মনে।

দুর্ভাবনায় শিউরে উঠে মাঝে মাঝে নিজের জন্যে আর স্মার্লিং-এর জন্যে চোখের জল ফেলতে হয়েছে জলিকে। তবু, নিয়তি যে এমনি করেই সব প্রতীক্ষার ছেদ টান্‌বে, একথা কি ও জানত? সব আশঙ্কা কি অবধারিত সত্য হয়? আন্টির চোখ দেখে এখন আর বিশ্বাস করতে কিছু বাধল না। নিঃসংশয়ভাবে জলি সব বুঝতে পারল।

—কোথায় মারা গেল? জঙ্গলে না হাসপাতালে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে শূন্য প্রাণহীন গলায় জলি শুধলো।

চমকে উঠলো আন্টি। চুপি-চুপি যেন ভয়ে ভয়ে বললে—'জঙ্গলে,—বীরের মতো, বাঘের সঙ্গে লড়তে!'

জলি তা জানে। স্মার্লিং অরণ্যচর; তার পশুপ্রীতি ভীষণ—! প্রীতি—না, না, প্যাসান। প্যাসান টু কিল; টু কিল বীস্টস্। হি ওয়াজ—ঃ জলি মনে মনে বললো, এ বীস্ট। আন্টির দিকে আস্তে আস্তে একবার তাকাল জলি। শূন্য স্তব্ধ দৃষ্টি। যেন বলছিল কি দেখছ, আমাকে—? আমি ত অরণ্য। পশুরা থাকে—অথচ থাকে না।

মেণ্টাল থ্রিল

রাত অনেক হ'ল। ঘড়িতে ঠং ঠং করে তিনটে বাজল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। শুধু এ-পাশ আর ও-পাশ। দীর্ঘনিশ্বাস আর হা হুতাশে ঘরখানি ভরতি।

অনেকদিনই তো রাতে যায় রোগী দেখতে সে। ফেরে অনেক রাতে। তখন সারাজগৎ বিভোর থাকে ঘুমে। এসেই শুয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। একটুও ভাবতে হয় না তার। হঠাৎ আজ কেন এমন হল? দম আটকে আসছে। একবার জানালার দিকে তাকাল শ্যামল। না, সব জানালাই তো খোলা। হুড় হুড় ক'রে বাতাস আসছে ঘরে। তবে কেন এই গুমোট? হাতের কাছেই ছোট টেবিলের ওপর পাখা। টেনে নিলে সেখানা। কে যেন চেপে ধরল হাতটা। উঃ, কি লোহার মত শক্ত হাত। একটা চাপেই যেন সারাদেহ ব্যথা হয়ে গেছে। পাখা ফেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, মনে করল। কিন্তু বাঁচল কই? বিষ লেগে গেছে হাতে। বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে সারাদেহে।

পাশেই শুয়ে বেলা। উঃ, বলে পাশ ফিরে শুল একবার। নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিষ। শ্যামল ভাবলে—কি জানি, তাকেও ধরেছে বিষে। আর ঘুমুতে পারবে না নিশ্চয়। কিন্তু কই, তা তো নয়! আবার নাক ডাকার শব্দ। উঃ, কি বিশ্রী শব্দ! বড় ঝাঁঝালো। বড্ড ভয় করে শ্যামলের। একবার ভাবলে, বেলাকে ডাকে। ডাকতে পারল না।

ঠোঁট নড়ে, কিন্তু শব্দ নেই। বড় পিপাসা পেল। পাশের ঘরে কুঁজোয় জল। উঠে গেল আস্তে আস্তে। ভয়ে শির-শির ক'রে উঠল তার হাত-পা। যদি আবার হাত চেপে ধরে কেউ? ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেল। একটু পরেই পেট ফুলে ঢাক। একটু নড়-চড়া করলেই জল ডাকছে কলকল ক'রে তবুও কণ্ঠনালী শুষ্ক। একটুও ভিজল না।

মস্ত বড় ঘর। অনেক বড় বড় জানালা-দরজা। প্রচুর আলো-বাতাস। তবু এত গুমোট? ভাবতেই শ্যামল আঁতকে ওঠে ভয়ে। লেখা কেমন ক'রে আছে ঐ ছোট টিনের ঘরটায়? বাঁশের দেওয়াল। কুঁচি কুঁচি খড়, গোবরমাটি ফেনিয়ে লেপা তাতে। বাঁশের তৈরি ছোট ছুটি জানালা। কি-ই বা বাতাস আসে তা দিয়ে? তারপর নেই ছাদ। গরমে তাতা টিন। কার সাধ্য, সেখানে থাকে। এছাড়া, বিষ তার ঘরেও ঢুকেছে নিশ্চয়! চিট-মিট করছে তার সর্ব অঙ্গ। শ্যামল আর ভাবতে পারে না। মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বালিশে।

এ কি করলে লেখা? মাথা খারাপ হয় নি তো তার? লেখার ওপর বড্ড রাগ হল শ্যামলের। আগে কেন খবর দিল না? আর দরজাই বা খোলা রেখেছিল কেন? দরজা বন্ধ ক'রে শুলে তো এমন কিছু ঘটত না।

তারপর কষ্ট কি কম হয়েছে শ্যামলের? ছুটো চোখে-মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাত দশটায়। একেবারে বাড়ির কাছেও নয়। বেশ একটু দূরে। কমসে কম বিশ মিনিটের পথ। তারপর যা রাস্তা! মনে পড়লেই গায়ে জ্বর আসে। পায়ে-হাঁটা পথ বাঁশঝোপের ভেতর দিয়ে। বাঁশের

ঝরামরা পাতায় ভরা পথ। ভয় হয় চলতে। সাপ-পোকা লুকিয়ে থাকে ঐ পাতার ভেতর। পাতাগুলো শপ শপ করে চললো। মনে হয়, কেউ বুঝি আসছে পেছনে। টর্চটা জ্বালল শ্যামল। ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে গেছে। খেয়াল ছিল না মোটেই। বন্ধ ক'রে দিল টর্চটা। এর চেয়ে বাঁশঝোপের জোনাকির আলো অনেক ভাল।

বেলা বলল—'কোথায় যাচ্ছ রোগী দেখতে? আঁধার রাত। রাম সিং বরং তোমার সাথে যাক বাতি নিয়ে।'

—'না, দরকার হবে না' বলল শ্যামল। 'টর্চ নিয়ে যাব। ওতেই হবে। বড় চোরের ভয়। রাম সিং বাড়ীতেই থাক। কখন ফিরি, তার তো ঠিকানা নেই!'

লেখার ঘরের পাশেই শিশির মিত্তিরের বাড়ি। লোক গিজগিজ করে সে বাড়ীতে। ছোট বাড়ি। মাত্র তিনখানা ঘর। ছোটবড় পনের জন লোক। কোনমতে ওর ভেতরে মাথা গুঁজে থাকে তারা। তারপর সেদিন সোনায় সোহাগা, এল জামাই-মেয়ে। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়েছে তখন। একটু ভাবনায় পড়ল সবিতা, শিশির মিত্তিরের বউ। কোথায় শুতে দেবে জামাই-মেয়েকে?

জামাই-মেয়ে আসবে, তা জানা ছিল না। দুপুরে যা তরি-তরকারি রান্না করেছিল, তা দুপুরেই শেষ হয়ে গেছে একরকম। আছে শুধু এক টুকরো মাছ আর একটু ঝোল শিশিরের জন্যে। সে মাছ ছাড়া খেতে পারে না। ছেলেমেয়েরা বড় একটা মাছের ভক্ত নয়। তারা ভালবাসে পেয়াজ-সম্বরা মুসুরির ডাল। সেটি তো রান্না করতেই হবে। কিন্তু শুধু মুসুরির ডাল-ভাত জামাই-মেয়ের সামনে

দেয় কি ক'রে? মেয়েকে না হয় যা-তা দিল—জামাইকে দেয় কি করে?

সবিতা রান্নাবান্না নিয়ে বড় ব্যস্ত। তার পিঠে ঝুলছে আড়াই বছরের মেয়েটি। ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কাঁদছে, আর মায়ের পিঠে ঢুড়ুম ঢুড়ুম ক'রে চড় মারছে। কোলের ছেলেটির বয়স এক বছর—বড় বিরক্ত করে। পিসি শ্যামাদাসী তাকে কোলে ক'রে বারান্দায় বসে ঘুম পাড়ানো গান গাইছেন।

ডালে কাঁটা দিতে দিতে সবিতা বলল—'বলুন তো পিসিমা, জামাই মেয়েকে শুতে দেই কোথায়?'

—'কেন, এমন কি হল ভাবনার?' বলে উঠলেন শ্যামাদাসী। 'তোকে ও ভাবনা ভাবতে হবে না বউ। আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। লেখার কাছে থাকব আমি। একটা রাত বই তো নয়! না-হয় একটু কষ্ট হবে!'

সবিতার ঘাড় থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল।

ভাবলে, উঠে বসে একবার কিন্তু উঠতে পারলো না শ্যামল। মাথা ঘুরছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুক দপ দপ করছে। কে যেন মশলা পিষছে বুকের উপর।

মনে পড়ল লেখার কথা। উঃ, কি যন্ত্রণাই না সে পাচ্ছে! নিজেই নিজের ওপর রাগ করছে, কি জানি। লেখা হয়তো ভাবছে—যত রাতই হ'ক, খবর দেওয়া উচিত ছিল তার। শ্যামলের খুব রাগ হয়েছে নিশ্চয়! রাগ হবারও কথা। এতে কার না রাগ হয়। যে বেয়াকুফ হয়েছে সে! সেও তো যা হোক একজন মানী লোক! হোক্ না সে হাতুড়ে ডাক্তার। তবু তো ডাক্তার। কত

খাতির করে লোকে, কত বিশ্বাস করে। হয়তো সে ভাবছে, এর মূলে আছি আমি। আর না থাকলেইবা কি? এটা ভাবা তো নিতান্ত স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই নিজেকে ছাপাই রেখে অনেক বিনিয়ে বলেছি তার নামে।

শ্যামল ভাবতে পারে না। চোখ বুজে পড়ে আছে বিছানায়। শব্দ শুনে চমকে ওঠে। বড় বড় চোখ ক'রে এদিক সেদিক তাকায়। কেন, কেউ তো নেই? তবে কার গলা শুনলাম—কে, কে, কে? উঃ, কি কর্কশ স্বর! চোখ দুটোই বা কি? জ্বলজ্বল করছে এত আঁধারেও। যেন শিকারী বাঘের চোখ। গা শিরশির ক'রে ওঠে শ্যামলের। আবার চোখ বুজে পড়ে থাকে।

ভোর হয়েছে অনেক আগে। বেলা উঠে গেছে। শ্যামল তখনও শুয়ে।

আস্তে আস্তে পূবদিক সোনালী হয়ে উঠল। গাছের পাতায় ঝিক্ঝিক্ করছে রোদ। জানালা বেয়ে এল তার এক মুঠো বিছানায়—রাতের অবসাদ দূর করতে। তবুও শ্যামল শুয়ে।

অনেক বেলা হল। এদিকে ডাক্তারখানা রোগীতে গিজগিজ করছে।

বেলা খাবার ও চা তৈরি করছিল রান্নাঘরে। কানে এল লোকের কলরব; তামাক খাওয়ার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ। এর আগে রাম সিং এসে দু' একবার খোঁজ খবরও নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে।

শোবার ঘরে ঢুকেই বলল—'ও মা, তুমি যে এখনও শুয়ে আছ? কি আশ্চর্য লোক তুমি! এত কড়কড়ে আগুনে রোদ লাগছে গায়ে, তবু খেয়াল নেই? কি হল তোমার আজ? শরীর খারাপ করে নি তো? ডাক্তারখানা যে রোগীতে ভ'রে গেছে।'

—'বড় মাথা ধরেছে' বললে শ্যামল। 'উঠতে পারছি নে। ঘুরিয়ে ফেলে দিচ্ছে। কম্পাউণ্ডারকে বলে দাও—আজ কোনমতে চালিয়ে নিতে। কাল দেখা যাবে।'

—'অ্যানাসিন কি অ্যাস্‌পিরিন খাও না কেন!' বললে বেলা।

একটু শুক্‌নো চিপসে গালের হাসি হাসলে শ্যামল। সে ভাবছে—কি অসুখ, আর কি ওষুধ খাব? মাথা ধরেছে বটে! বসতে কি দাঁড়াতে পারছি নে মোটেই। কে যেন ঠেলে ফেলে দিচ্ছে! এ কি অ্যানাসিন, অ্যাসপিরিনে সারে? এ যে মেণ্টাল থ্রিল! এর চিকিৎসা ডাক্তারী শাস্ত্রে নেই।

দু-দিন পরে গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়েছে। একজন সাধু এসেছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কতকাল তেল-চিরুনি পড়েনি তাতে। ময়লায় ময়লায় শিবের জটা পাকিয়েছে।

নদীর ধারেই একটা বিরাট বটগাছ। তার তলায় সে তার আস্তানা পেতেছে। ধূপ-ধূনা জ্বেলেছে সেখানে। দিনে-রাতে সব সময়েই রাবণের চুলা জ্বলেই আছে। সাথে দুটি চেলা। গুরুর আদেশ পালনে সর্বদাই উৎকর্ণ তারা।

প্রচুর লোক-সমাগম হতে লাগল সেখানে। ছোটবড় কেউ বাদ গেল না। কারও কারও নাকি ওষুধও দিচ্ছে ধরাপড়া করলে। বাদলের শূলব্যথাও নাকি সারিয়ে দিয়েছে সাধু।

শ্যামলের বড় ইচ্ছে সাধুকে একবার দেখে। অত লোকের সামনে যায় কি ক'রে? যদি রটে গিয়ে থাকে সেদিনকার কথা? না, দিনের বেলায় কিছুতেই যাওয়া চলবে না। ভন্‌ভন্ ক'রে মৌমাছি ঘুরছে সেখানে। ভয় হয়—যদি কামড়ে দেয়? রাতে যাবে। তখন বড় বেশি লোকজন থাকবে না।

রাত ন-টায় ঠুকঠুক ক'রে যাচ্ছে সেখানে। হাতে সেই টর্চটা। নতুন ব্যাটারি লাগিয়েছে। এবারে আর আলোর অভাব নেই। জোনাকির আলোয় পথ দেখে যেতে হবে না। হঠাৎ প্রাণটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল কেন? আবার সেই বাঁশের ঝোপ! সাপপোকে কামড়ে দেবে না তো?

একটুক্ষণ পরই শ্যামল এসে পড়ল নদীর পাড়ে। সেই বটতলায়। দু চার-জন লোক তখনও রয়েছে সাধুর কাছে। কে যেন চেঁচিয়ে বলল—'আরে, ডাক্তার যে! এস, এস।' চোখ বুজে ছিল সাধু। চিৎকার শুনে শ্যামলের দিকে তাকাল একবার। একটু মুচকে হাসল সাধু। চোখ ঘুরিয়ে নিল শ্যামল। ঘুরতেই দেখে সেই বুড়ি। শিশির কাকার পিসি। তারই দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকাচ্ছে। আর তার একটু দূরে বসে লেখা। আর এক মুহূর্তও থাকতে পারল না শ্যামল। আস্তে আস্তে হাঁটা দিল সেখান থেকে। কে যেন পিছন থেকে বলল—'চলে যাচ্ছ কেন ডাক্তার?' মনে করল একটা

কিছু কিছু জবাব দেবে। কিন্তু পারল না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর ততক্ষণে সে অনেক দূর চলে গেছে।

বুকে ঢাকঢোল পেটাচ্ছে কে।

সাধু বলল—'ভুত দেখেছে। সেদিন রাতে ওকে চেপে ধরেছিল কিনা?' একটু হাসল সাধু।

সকলেই সাধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সারা বট গাছের তলাতে যেন বিস্ময় থই থই করছে। সাধু আবার একটু হাসল।

লেখা মুখ নিচু ক'রে কি ভাবল অল্পক্ষণ। তারপর মারলে ছুট। এক দৌড়ে এল বাঁশের ঝোপের পথে।

শ্যামলের পা সরছে না। পায়ে পায়ে টাল খাচ্ছে। বেশি দূর যেতে পারে নি সে। ঝরা বাঁশপাতার খক্ খক্ শব্দে চমকে উঠল। কানে এল 'কে—কে—কে?' আবার সেই ডাক। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল—'ভয় নেই ডাক্তার। আমি লেখা।'

'ওঃ, তুমি লেখা?' যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল শ্যামল।

অল্পক্ষণ পর দুজনেই কেঁপে উঠল ভয়ে। কার পায়ের শব্দ না? কে যেন আসছে? ঐ যে লণ্ঠন হাতে? শিশির মিস্তিরের পিসি না?

শ্যামল ঢুকে পড়ল বাঁশের ঝোপে।

—'বড় আঁধার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ডাক্তার। আমার হাত ধর।' বলল লেখা।

সন্তা ন

হঠাৎ আবার একটা অপরাহ্নে কেঁপে ওঠে সারা অফিস ঘর আর তার প্রাঙ্গন। ঝুপ্ ঝুপ্ করে ঝরে পড়ছে কৃষ্ণ-চূড়ার কারুকার্যখচিত সুচারু পাতলা পাতাগুলো! চোখে ঝাপসা দেখে ভবেশ। সন্তর্পণে চশমাটা খুলে নেয় চোখ থেকে, কি জানি ধুলোমাটির ছাপ লেগেছে। চোখ দুটো বেশ করে রগড়ে নিল আগে, তারপর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সদ্য-ধোওয়া সাদা ধবধবে রুমালখানা বার করে লেন্স দুটো মুছতে মুছতে আবার উঠানের দিকে তাকায়। বিনা চশমায় আরো ঝাপসা দেখে। লেন্স দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে চোখে পরলো। যথা পূর্বং যথা পরং। আবার চশমা জোড়া খুলে নিল চোখ থেকে। লেন্সে মুখের তাপ দিয়ে বার বার মুছল ভাল করে। কোনই উন্নতি হলো না। আগেও যা দেখেছে, এখনও তাই। রাগদাই বটে। মাথার মধ্যে ভোমরা ডাকছে ভোঁ ভোঁ করে। বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে ভবেশ। উঃ, কী বীভৎস, কদাকার চেহারা! চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ছুটে আসছে! রাক্ষসের চোখ, ঘাতকের চোখ, রক্তলোলুপ বাঘের চোখ! দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! প্রতিহিংসার আগুন।

ভবেশ অনেক শিকার করেছে, বনের অনেক হিংস্রতা দেখেছে সে, বাঘ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করেছে, তবু ভয় পায়নি। বরং উল্লাসে নেচে উঠেছে। তার অট্টহাসিতে

কেঁপে উঠেছে বনজঙ্গল আর তার পশু পক্ষী। আর আজ।

ভবেশ ইচ্ছা করলে রাগদাকে বাঁচাতে পারত জেলের হাত থেকে। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে। কিন্তু তা সে করেনি। তাতেই হয়ত ওর খুব রাগ হয়েছে। প্রতিশোধ নেবে? অশিক্ষিত ধাঙড়ের কি বিশ্বাস আছে, ওদের কি কোন হিতাহিত জ্ঞান আছে। একেবারে সাবাড় করেও দিতে পারে?

স্ত্রী নন্দা তো আগেই বলেছিল—চলো চলে যাই এখান থেকে। এই ধাঙড়ের দেশে মানুষ থাকে? না হয় গাছতলায় থাকব, একবেলা দু'টো নুন-ভাত খাব।

একটু হিমেকাঁপা হাসি হেসেছিল ভবেশ। আপন মনেই বললে—এখন তো ভালো মানুষের মত বলছ কিন্তু তখন আর হাসি থাকবে না ঠোঁটে। ঐ লালচে ঠোঁটে কালচে দাগ পড়বে।

ওকী ওর চোখে জল কেন? একটা কথা ও তো বলল না কাউকে? শুধু একটিবার ভবেশের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে খোলসছাড়া সাপের মত নিঃশব্দে সরে পড়ল।

তবে কেন, কি জন্য এসেছিল? খালাস পেল কবে? নানা জিজ্ঞাসা জাগে মনে।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে চেয়ারটাতে একটু জোরে চেপে বসে একটা সিগারেট ধরায় ভবেশ। কেমন যেন ভয় ভয় করছে, কিছুতেই ভীতির ঘোর কাটছে না! অনেক কথাই ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। হঠাৎ মনের গভীরে জাগল, ছয়মাস আগের একটা কথা। সেদিনও

এই রকম সারা অফিস আর প্রাঙ্গন কেঁপে উঠেছিল। সেই সময়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি ছিল ফুলে ভরতি। ফুলগুলোকে ঝরে পড়তে দেখেছিল ভবেশ। বোমা ফাটার মত একটা অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছিল। মন হলো গুদামের ইঞ্জিনের পিস্টনটা ভেঙ্গে গেল। মুহূর্তে অজস্র লোক ভেঙে পড়ল অফিস প্রাঙ্গনে। লোকে লোকে থই থই করছে। সকলের হাতেই ছোট বড় বাঁশের লাঠি অথবা আছোলা বাঁশের আগা।

নিজেকে সামলিয়ে নিতে পারেনি ভবেশ। অস্থির মস্তিকে স্থির হয়ে ভাববার অবকাশ পেল কোথায়? বারান্দায় গিয়ে জড়-ভরতের মত অবাক দৃষ্টিতে জনতার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আগুণে বাতাস। কৃষ্ণচূড়ার আগুণ ফুলগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার তিন চারটে ছিন্ন পাপড়ি উড়ে এসে ভবেশের মাথায় পড়ল। ব্রহ্ম তালুতে আগুণ জ্বলে উঠল রি রি করে।

জনতার দৃষ্টি ভবেশের দিকে। সে খেয়াল তার নেই। সে এলোমেলো মস্তিষ্কে কারণ উদ্ভারনের চেষ্টা করছে।

চতুর্দিক থেকে নানা জাতীয় নানা কথা ভেসে আসছে। বারো জনের বারো কথা, কারো কথাই স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেনা ভবেশ। হঠাৎ কানে এল মারো শালাকো, মারো, ওহি তো মন্ত্রী হেকে। মন্ত্রীকো দাবাই দেনে পড়ছো, আরো কত কি। যেদিক থেকে সব চেয়ে জোরালো আওয়াজটা এল, সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেল—একটা বিরাট কৃষ্ণকায় কালাপাহাড়ের মত দেহ। শিকারী বাঘের মত চোখ থেকে আগুণের ফুল্‌কি ছুটছে।

নিমেষে মাথার ওপরে ঘুরল একটা বড় লাঠি। শুধু সেইটুকুই দেখেছিল ভবেশ। টাল সামলাতে পারেনি। মাথা ঘুরে পড়ে গেল বারান্দার ওপর।

এরপর আর কিছু কানে শুনতে পায়নি সে। চোখেও দেখেনি। চোখ বুঁজে পড়েছিল।

চোখ মেলল চার ঘণ্টা পরে। বোকা বোকা ড্যাব ড্যাবে চোখে সবদিকে তাকাল একবার। বুঝতে পারে না সে। মাথা ঘুলিয়ে যায় ভাবতে। সে কোথায়, কে তাকে আনলে এখানে?

অনেক লোক জমেছে হাসপাতালে। ডাক্তার সকলকে সরিয়ে দিয়ে বলল—ঘাবড়াবার মত তেমন কিছু হয়নি বড়বাবু। দু'দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবেন।

একটা হুঁ শব্দ করে আবার চোখ বুঁজল ভবেশ।

মোটেই ঘুম হয়নি রাতে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবুও এর এক ফাঁকে মনে পড়ল দু'মাস আগের একটা ঘটনা। শিউরে উঠল সেকথা স্মরণ করে। শুয়োরে মানুষে লড়াই। এখনো .ক জানি সে ঘা শুকোয়নি ভাল করে। পুরোপুরি ভাবতে পারে না সে কথা। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

শ্রাবণের বর্ষণমুখর সে বিকেল। আকাশ ভরতি খণ্ড খণ্ড মেঘের মেলা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে চা জলখাবার খেয়ে বন্দুকটি নিয়ে বেরুচ্ছে ভবেশ।

নন্দা এগিয়ে এসে বলে—কোথায় যাচ্ছ এই ঘোর মেঘলা সন্ধ্যেয়?

—এই তো খড়-জঙ্গলে। সকাল সন্ধ্যেয় অনেক হরিণ,

জংলী মুরগী আসে সেখানে। দু'একটা মারতে পারি কি-না, দেখে আসি একটু? আজ এক হপ্তা তো রীতিমত বিধবার আহার চলছে।

নন্দা নরম গলায় হেসে বলল—আহারেই না হয় বিধবা হয়েছ কিন্তু বিহারে তো পুরোদস্তুর ষোড়শী সধবা দেখতে পাচ্ছি।

খড় বন। বকের মত নিঃশব্দে পা টিপেটিপে চলেছে সামনে ঝুঁকে। ঝাঁ করে দুটো মুরগী উড়ে গেল কক্ কক্ করে মাথার ঠিক ওপর দিয়ে। কী আকুতি কাকুতি মিনতি ভরা স্বর! মন একটুও ভিজেনি তাতে। বরং মনে হলো উপহাস করছে ওরা! নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় দুঃখ হলো মনে। আকাশপথে তাকিয়ে উড়ন্ত মুরগী দুটির গতিবিধি লক্ষ্য ক'রলে ভবেশ।

খড় বনের লাগোয়া রিজার্ভ ফরেষ্ট। সেখানে ছোট বড় অনেক শিকার মেলে। বাঘ, ভালুক, বরাহ সবই আছে। ধীরে সুস্থে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে হেটে চলছিল সেই দিকে, হঠাৎ শুনতে পেল একটা সকরুণ আর্তনাদ,—বাঁচাও আমাকে! সারা রিজার্ভ ফরেষ্ট আর খড় জঙ্গল কেঁপে উঠল। শালপাতার কানে কানে সেই আর্তনাদ আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে ভেসে গেল দূর দূরান্তরে। ভীত পশুপক্ষীর কী অলক্ষ্য গতি! দৌড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হলো। তখনও সেই একই চিৎকার—বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও আমাকে।

দৃশ্য দেখে প্রাণটা চমকে উঠল! রাগদা সর্দারের বিরাট

যমদূতের মত দেহ লুটিয়ে পড়ে আছে একটা বৃহৎ চার পাঁচ মণ ওজনের বরাহের পাশে। ওদের যেন কত কালের পরিচয়! জড়সড় হয়ে এ ওর কোলে শুয়ে আছে। শুয়োরটার পিঠে দু'টো বর্শা। তীরের মাথায় পাখির হালকা শাদা কালো পালক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কেঁপে ও কেপে উঠছে। বর্শা দুটোর গোড়া দিয়ে টপ্ টপ করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রাগদার বাঁ হাতটার কনুই পর্যন্ত বরাহটার মুখগহ্বরে। রাগদার বিক্ষত হাতের রক্তে শুয়োরটার মুখের ভেতর-বাহির অস্বাভাবিক লাল। মনে হচ্ছিল, শুয়োরটা রক্ত বমন করছে। দু'টি প্রাণীরই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। উভয়েরই কেমন উদাস, অলস ভাব! চোখ বুঁজে ঝিমুচ্ছে আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে যন্ত্রণায়! একবার একটু চোখ মেলে আবার বোজে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল একবার বরাহটা, শেষে ঝিমিয়ে পড়ল আবার। রাগদাও চোখ মেলে চেয়েছে ভবেশের জুতোর থপ্ থপ্ শব্দে, আর শুকনো ঝরাপাতার খচ্ খচ আওয়াজে। এখনও ভুলতে পারেনি সে কী কাকুতি, ভিক্ষা! ভবেশকে বললে—হাম্‌কো বাঁচাইয়ে বড়বাবু! জীবন-ভর তোমার নোকর হয়ে থাকব।

উঃ! কী যন্ত্রণা। আর ভাবতে পারে না ভবেশ! শরীর এলিয়ে পড়ে, মাথা ঘুলিয়ে যায়। আজকার চাউনি আর স্বরের সঙ্গে ছয়মাস আগের সেই চাউনি ও স্বরের কোন সঙ্গতি বা মিল নেই! আগের সেই চাউনি ও স্বর ছিল কেমন বিনম্র, বৈরাগ্যের! আর আজকার স্বর উঃ! বুক ফেটে যায়, গা ঝিম্‌ঝিম্ করে……।

কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেনি ক্ষণকাল। ভয় হচ্ছিল মনে। শুয়োর মারতে মানুষ মেরে না বসে? দু'টোতো একাত্মা হয়ে আছে! বরাহটা আরো দু'একবার ভবেশের দিকে তাকাল। আধো-বোজা চোখ যেন কেমন একটা বেদনা মাখা করুণা ভিক্ষাই করছিল! গুলিভরা বন্দুকটা তাক করে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল ভবেশ ওদের দিকে। শিকারী ছেড়ে শেষে তাকেই না ধরে বসে? বরাহটা একটুও নড়ল না। আরো খানিকটে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের নলটা শুয়োরটার পিঠে লাগিয়েই গুলি ছুঁড়লো। দু'-একবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করলে শুয়োরটা। দেহটা সামান্যই নড়েছিল। উঠতে চেষ্টা করেছিল প্রাণপণ কিন্তু উঠতে পারেনি। বন্দুকের নলটা দিয়ে গোটা চারেক গুঁতো মেরে বুঝতে পারলো, তার দেহের শেষ স্পন্দনটুকু ছয় নম্বর গুলির বারুদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশে উধাও হয়েছে। অনেক টানাহেঁচড়া করে শুয়োরের মুখ থেকে রাগদার হাত বার করলো! হাতটার আঙ্গুল থেকে কনুই পর্যন্ত চিরে গেছে বরাহটার ধারালো ছুঁচলো দাঁতে। ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে।

কী মর্মান্তিক দৃশ্য! গায়ে জ্বর আসে, মস্তিষ্কের ক্রিয়া লোপ পায়। রাগদার সেই পাথরের মত শক্ত শরীরও নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। দু'একবার ভবেশকে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ভবেশের সমস্ত দেহে, খাঁকি রঙের জামা-প্যান্টে তাজা লাল টক্‌টকে রক্ত লেগে গেল। নিজেকে যেন খুনী আসামী মনে হচ্ছিল ভবেশের।

বড় মুস্কিলে পড়লো ভবেশ। কি করে? তার মত ক্ষীণকায় খর্ব লোক রাগদার বিরাট বপু বইতে পারবে

কেন? নিকটেই বড় সড়ক। সড়কটা বনের হিংস্র সৌন্দর্যের বুক চিরে নিশিথিনীর নীরব নিস্তব্ধ বুকে সগর্বে দণ্ডায়মান। সজোরে একটা চিৎকার করলো ভবেশ—কে আছ কোথায়, একবার এদিকে এস?

একটা স্বর্ণ মুহূর্ত। সেই ঘোর মেঘলা সন্ধ্যায়, বনের হিংস্রতা ভেদ করে মুহূর্তের জন্য ফুটে ওঠে মেঘমুক্ত বিকেলের এক ঝলক শান্ত সোনা রোদ! রাগদা হাসল। সে হাসিতে ফুটে উঠেছে জীবনের স্বাদ—বেঁচে থাকার ইচ্ছা, সার্থকতা।

অচিরেই মোটরের হর্ণের আওয়াজ ভেসে এল বহুদূর থেকে। যন্ত্রচালিতের মত রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল ভবেশ। মনের অতলে একটা আনন্দ-সমুদ্রের কল্লোল জাগল। ছোট একখানি কালো মোটর আসছে। বোধ হয় অষ্টিন। অষ্টিনই বটে। বুঝতে দেরি হলো না,—মটরটা তাদেরই ছোট সাহেব মিষ্টার টেনির। না, আর কারো হতে পারে না। বাগানে তো কেবলমাত্র দু'খানি কার। একখানি বড় সাহেব মিষ্টার সিড্‌নির আর একখানি এই মিঃ টেনির। বড় সাহেবের মটর তো একটা বিরাট প্লিমাউথ। তারপর সেটি মেরুন কালারের। আর ভবেশদের বাগানের লাগোয়া উপরে পাহাড়ের কোলে শুধু একটি মাত্র বাগান। এরপর আর দ্বিতীয় বাগান নাই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, বন আর বন। সেখানকার ছোট সাহেবের কোন 'কার' নাই। তিনি চলাফেরা করেন মটর সাইকেলে। বড় সাহেব মিঃ মঙ্কের একটা মটর আছে বটে তবে সেটি চক্‌লেট কালারের। আর তার একজষ্ট পাইপ দিয়ে যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে রাস্তাঘাট বনজঙ্গল আঁধার করে দেয়।

ভবেশকে দেখতে পেয়ে মিষ্টার টেনি কার থামিয়ে বললেন,—গেট ইন্।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভবেশ খুলে বললো তাঁকে।

মটরের রাস্তা নাই ঘটনাস্থলে যাওয়ার। রাস্তায় মটর রেখে হেটে চলল দুজ'নে। মিষ্টার টেনি তো দৃশ্য দেখে, 'মাই ক্রাইস্ট' বলে চেঁচিয়ে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। শেষে দুইজনে হাতাহাতি ধরে নিয়ে রাগদাকে মটরে উঠিয়ে নিলেন।

হাসপাতালে ছিল সে পুরো তিনটি মাস।

এই ঘটনার পর থেকে তাকে যেন ভবেশের কেমন মায়া মায়া লাগত, দরদ উথলে উঠত। মনে হতো ও যেন কত আপন জন। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় দু'বার তাকে দেখতে যেতো হাসপাতালে। সে তার কৃতজ্ঞতামাখা নরম চোখে চেয়ে থাকত ভবেশের দিকে। চাউনিতে বোঝা যেত, সে কিছু বলতে চায় কিন্তু মুখ থেকে কথা বেরোত না। কি জানি ভাষা হারিয়ে ফেলতো। শেষে চোখ ফিরিয়ে নিত অন্য দিকে, কি যেন ভাবত আনমনা।

এরপর শাকসব্জি তরি-তরকারি যখনকার যা তার বাড়িতে হতো, আগে ভবেশকে না খাইয়ে খেত না সে। তাকে আর বড়বাবু বলে ডাকত না, বাবা বলতো!

ভোরের দিকে একটু ঘুম এল ভবেশের।

বেশ বেলা হয়েছে। জানালা দিয়ে সকালের ফুলঝুরি রোদ ঢুকেছে ঘরে। ডাক্তার এসে ফিরে গেলেন একবার। ভবেশ তখনও ঘুমুচ্ছে।

হঠাৎ হাসপাতালের ঠাকুরের হাত থেকে একটা চা-শুদ্ধ কলাইকরা পেয়ালা বারান্দায় সিমেন্টকরা মেঝের ওপর পড়ল। তার খ্যান্ খ্যান্ আওয়াজে ভবেশের ঘুম ভাঙল।

একটুক্ষণ বাদে ডাক্তার এলেন আবার। ভবেশকে বললেন—এই তো বেশ ঘুমুচ্ছিলেন একটু আগে, তা হলে ভাল আছেন নিশ্চয়?

ভবেশ কোন জবাব দেয়নি, কি জানি দিতে পারেনি। কেমন যেন একটা লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে ঘিরে ধরেছিল ওকে। শুধু মনমরা চোখে একবারটা তাকাল ডাক্তারের পানে।

এক হপ্তার মধ্যেই সেরে উঠল ভবেশ।

আন্দোলনকারীদের অনেককেই পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। রাগদাও তাদের মধ্যে একজন।

মামলা চলে। তাতে সকলেই খালাস পেল কিন্তু রাগদার জেল হয় তিন মাসের।

গোলমালের ইতিহাসটা তেমন বড় একটা কিছু নয়। বড় বড় ব্যাপারগুলো ঝড়ের মত একটানা একসুরে উড়ে যায় কিন্তু ছোট ছোট ব্যাপারগুলো ঘুর্ণীবার্তার মত ঘুরে ফিরে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে একটা তালগোল পাকিয়ে তোলে। এও ঠিক তাই।

চা বাগান।

জানুয়ারীর প্রথম। কলমের মেলাতে কলম করছিল স্ত্রীপুরুষে। এর মধ্যে একটা লোক বলে ওঠে—কালচিনি বাগানে মেয়ে-পুরুষের ঠীকা কমিয়ে দিয়েছে। একটা মৃদু

গুঞ্জন চলতে থাকে মেলাতে। এ ওকে বলছে বল না সাহেবকে, আমাদের ঠীকাও কমিয়ে দিতে হবে। কেউ এগোয় নি, হঠাৎ একজন নেপালী মজুর বলে ওঠে—কস্তো হো, কই পণি ভনদাই না! হেরন্নু, মো ভন্ছু! এই বলে সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—কলমকা ঠীকা কমতি করনে পড়্ছো সাব্। কমতি করদাই না পিছে হামিয়ারো কাম করদাই না।

বড় সাহেব সিডনি মেলাতেই ছিলেন তখন। মজুরদের দাবী মেনে নিলেন না তিনি।

জনতাও কথায় কথায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

চা চাষের ভেতরে ভেতরে লাইন করা শিরীষ গাছ। বিক্ষুব্ধ জনতা লাল হয়ে ওঠে। মুহুর্মূহু চিৎকার শোনা যাচ্ছে নানা জাতির নানা ভাষা—দাবী মান্‌নে হোগা, হামিয়ারোকো কোরা মান্‌নে পড়ছো, রাখ্‌নে পড়ছো' সাহেব বাবুকো কুট্‌নে হোস্, অফিস গুদাম ভাঙনে হুনছো। এই ধ্বনিতে বারেবারে কেঁপে উঠছিল অফিস, গুদাম, বাগান। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিল শিরিষের পাতা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে চা শিরিষের ছোট বড় গাছগুলো।

রাগে গজ্‌গজ্ করছে জনতা। কলমছুরি দিয়ে চা শিরিষের গাছে কোপ মারছে জোরে জোরে।

ভাবগতিক ভাল না দেখে মিঃ সিডনি একফাঁকে ঝাঁ করে অফিস পালিয়ে আসেন।

মেলার কাছেই বাঁশবাড়ি। ঘর মেরামতের জন্যে বাঁশ কাটা হচ্ছিল তখন। স্তূপীকৃত করা রয়েছে বাঁশ। নানা রকম কাজ এই সময়ে। গাড়ি, মটর বাগানে যা আছে তাতে

৩

সংকুলান হয় না সবদিন। কলমছুরি হাতে ছিল ওদের। এছাড়া সকলেরই হাতে এক একটা বাঁশের আগা। 'যুদ্ধং দেহি' সাজে আগের সেই শ্লোগান আওড়াতে আওড়াতে অফিস এসে হাজির হলো।

এর পরেই ভবেশকে আক্রমণ!

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দিনের আলো অন্ধকারের গর্ভে বিলুপ্ত। বাড়িতে পা দিতেই অন্দর মহলের দু-একটা কথা শুনতে পায় ভবেশ—হাম্ হিঁয়াপর রহেগা মাঈ, বাপকো সেবা করেগা।

গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছে ভবেশ। একটু ভয়, একটু বিস্ময়! কোন কুমতলবে আসেনি তো? অফিসে অনেক লোক দেখে সাহস পায়নি হয়ত। সাবধানের মার নেই। খালি হাতে সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। ঘরে গিয়ে টুক্‌রীর ঠিকাদারের দেওয়া আসামবেতের মোটা লাঠিটা হাতে করে মাঝ-উঠানে এল। সেখানেই নন্দার দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে রাগদা।

ভবেশ যেতেই নন্দার পা ছেড়ে ভবেশের পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—আমাকে মারবে বাবা? লাঠি দিয়ে মারবে? মার, মার আমাকে, শুধু লাঠি কেন তোমার সেই বন্দুকটা নিয়ে এস। যে বন্দুক দিয়ে একদিন বাঁচিয়ে ছিলে আমাকে, আজ আবার সেই বন্দুক দিয়ে মার। তবেই যদি আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ভবেশ পা ঝাড়া দিল কিন্তু রাগদার শক্ত হাতের কঠিন

বন্ধন শিথিল করতে পারল না। রাগদার চোখের অশ্রান্ত জলধারা ভবেশের জুতোজোড়া ভিজিয়ে জবজবে করে দিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমাকে মারবে বাবা?'

একটা অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল রাগদা। কী ভীতিবিহ্বল চোখ!

অজ্ঞান হয়ে পড়ে নাকি? ভবেশের বড় ভয় হয়। রাগদার হাত ধরে বলল—ওঠো, বারান্দায় গিয়ে বস। লাঠিটি হাত থেকে ফেলে দিয়ে শান্ত গলায় ভবেশ বলল—বাপে কি ছেলেকে ক্ষমা না করে থাকতে পারে?

চা খেতে খেতে নন্দা ভবেশকে বলল—মনে হয় ওর পরিবর্তন হয়েছে। তবু মন যেন কিছুতেই ওকে আর বিশ্বাস করতে চাইছে না।

ভবেশ নন্দার কথায় কান দিতে পারে নি। সে নন্দাকে বলল—তাই তো ওকে যে কাল বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছি এইমাত্র।

দাবাগ্নি

দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে বিজনবিহারী ফিরে এলেন আবার তাঁর কর্মস্থলে। সঙ্গে একমাত্র মেয়ে শাস্তা।

প্লাটফরমের বাইরে বাগানের গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ট্রাক্ দেখেই বিজনবিহারীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন—"সব ঠিক আছে তো ?" তারপর দেখে শুনে গাড়ীতে চড়ে বসলেন।

ফাল্গুন মাস। দুপুর বেলা। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঝিরঝির বাতাস বইছে। জানালার পর্দা বাতাসে অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। বাড়ির গা-লাগানো চা-বাগানে শিরিষ গাছে শুক্নো শুঁটির বাজনা বাজছে।

কাঠের বাড়ি। উপরে টিন। কড়ি-বরগার ফাঁকে ফাঁকে চড়ুইয়ের বাসা।

ভিতর বাড়ির চারদিকে দেশী-বিদেশী ফুল আর পাতা-বাহারের গাছ। মাঝখানটা ফাঁকা—কোন গাছ-গাছালি নেই। শুধু সবুজ ঘাসের গালিচা। এখানে বসে বিজন-বিহারী সকলকে নিয়ে সকাল বিকেল চা খেতে বসতেন। চারদিক থেকে এলোমেলো হাওয়া আর ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসতো।

বাড়িতে অন্য কোন লোক ছিল না। বিজনবিহারীর খাবার তৈরী হয়েছিল তাঁরই এক সহকর্মীর বাসায়। কিন্তু

খাওয়া তাঁর হলো কই? ঘরে ঢুকতেই বাতাসে জানালার পর্দাটা নড়ে একটা ছায়া পড়লো ঘরের মেঝেয়—একেবারে তাঁর সামনে। চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেলেন।

তারপর ধীরে ধীরে অভিভূত মনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ভিতরের ফুল বাগানে। একবার মনে করলেন সবুজ ঘাসের গালিচার উপর একটু বসেন। কিন্তু বসতে পারলেন না। ভাঙা হাড় এখনো যে ঠিকমত জোড়া লাগেনি। ফুল আর পাতাবাহারের গাছে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন। স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইলেন শূন্য আকাশের দিকে। তারপর তাঁর নজর পড়লো জাম গাছটার উপরে। কচি কচি পাতায় ভরতি গাছ। যৌবনের রূপশ্রী যেন টলমল করছে। বেগুন গাছে বেগুন, শিম গাছে শিম ধরে আছে। ছোট্ট আম গাছটি মুকুলে ভরতি।

সবই খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন তিনি। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো পাহাড় পার হয়ে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। দেখার অন্ত নেই—ঘনঘোর আঁধারেও তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে না আজ! চোখে যেন শতমণির জ্বালা।

শান্তা এসে ডাক দিতে তাঁর চমক ভাঙল। "অন্ধকারে কেন মিছেমিছি বাগানে ঘুরছ বাবা? ভেতরে এসো।"

শান্তা বাবার হাত ধরলে। বিজনবিহারী যন্ত্রচালিতের মতো চললেন শান্তার সঙ্গে সঙ্গে। শান্তা বললে—"কোন্ সকাল আটটায় দুটি খেয়েছ—আর এ পর্যন্ত জল স্পর্শ করলে না? ও বাড়ির কাকীমা ফল, দুধ আর পাউরুটি দিয়ে গেছেন। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।"

বিজনবিহারীর মোটেই খিদে পায়নি। কিন্তু মেয়ের মুখ-তাকিয়ে কিছু না খেয়ে পারলেন না।

কুচবিহার থেকে আসবার পথে ঘন শালের বন। সেই শাল বনের বুক চিরে চলেছে রেলের রাস্তা—মোটরের রাস্তা। রেল লাইন ও মোটর রাস্তার ক্রসিং-এ গাড়ি আসবার আগে থেকেই শুরু হলো ঝড়। দেখতে দেখতে জ্বলে উঠলো দাবানল। আরম্ভ হলো বনদেবীর আহুতি। সেই হোমের ধুঁয়ায় চোখে দেখলেন হিমের কুয়াশা। বিষাক্ত বাতাসে ভরে গেল পেট। সেই যে চারমাস আগে পেট ভরেছে—এখনো তা খালি হলো না।

সন্ধ্যা থেকেই শুরু হলো লোক সমাগম। অগুনতি বন্ধুবান্ধব এলেন দেখা করতে। সকলেই অবাক। কি শরীর কি হয়ে গেছে!

ক্ষীণকণ্ঠে সকলের কথারই খুব সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছিলেন তিনি। কথা বলতে সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল বিজনবিহারীর। তাই একে একে সকলেই বিদায় নিলেন। রাত বাড়ল। বিজনবিহারী ক্লান্ত, একাই বসে আছেন। কাছে পটের মতন শাস্তা দাঁড়িয়ে আছে। বিজনবিহারীর বুঝতে দেরী হলো না, তিনি শুতে না গেলে শাস্তা কিছুতেই শোবে না। কাজেই মেয়েকে শুতে বলে তিনিও শুয়ে পড়লেন।

ঘুম। ঘুম কোথায়? কিছুক্ষণ বিছানায় ছটফট করলেন তিনি। তারপর এক সময় বিছানায় উঠে বসলেন।

একটা সিগারেট ধরালেন। একটা একটা করে অনেকগুলো সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে গেল আর সেই সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে সমান তাল দিয়ে চলেছে তাঁর এলোমেলো চিন্তা।

জানালা খোলা ছিল। নজর পড়লো বাইরের দিকে। চমকে উঠলেন। ও কে দাঁড়িয়ে কলাবাগানে? কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কলাগাছগুলোর দিকে। বসেও থাকতে পারলেন না। বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন জানালার ধারে। একটু পরেই দমকা হাওয়ায় শুকনো কলার পাতাগুলো বেজে উঠলো। বিজনবিহারী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এবারেও ঘুম এলো কই? ঘুম আসবার আগেই বনের আগুন এসে আচ্ছন্ন করে ফেললো তাঁর শরীর মন। গুমোটে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সন্তর্পণে নেমে এলেন বিছানা থেকে। মশারি ফেলা ছিল। সেটাকে গুটিয়ে রাখলেন। আবার একটা সিগারেট ধরালেন। দু'একটা টান দিয়েই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। সিগারেটটা আপনা থেকে পুড়তে পুড়তে তাঁর আঙুলের ডগা ছুঁয়েছে। তবুও তাঁর খেয়াল নেই।

এলোমেলো কতো চিন্তা। আস্তে আস্তে মনের গভীরে জেগে উঠলো ছ মাস আগের কথা।

অসুখে পড়েছিল মায়া। অসুখটা যে কী তা ভালভাবে বুঝতে না পারলেও এটা যে পেটেরই একটা কিছু এ বুঝতে

বিজনবিহারীর কষ্ট হয়নি। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা—ছট্‌ফট্‌ করত মায়া। সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য!

একদিন রোগটা বেঁকা পথ নিল।

নিজের উপরে আস্থা হারিয়ে ফেললেন তিনি; ভাল ডাক্তার হয়েও। ডেকে পাঠালেন আর একজন ডাক্তার বন্ধুকে পরামর্শ করবার জন্যে। অবশ্য এর ভেতর তিনি যে কোন ওষুধপত্র দেননি তা নয়। একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন। একটা ইনজেকসনও তৈরী করে রেখেছেন টেবিলের ওপর।

অজ্ঞানের ঘোরে পড়েছিল মায়া। পাশে বসে তাঁর চার মেয়ে। বিজনবিহারী কেবল ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করছেন।

একটুক্ষণ পরেই ডাক্তার বন্ধুটি এলেন। দু'জনেই একমত। শুরু হলো পেনিসিলিন ইনজেক্‌সন।

একদিন পরে রোগীর অবস্থা ভাল দেখা গেল। কিন্তু তবুও বিজনবিহারী নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তখনও চিন চিন ব্যথা চলছেই।

স্ত্রীকে বললেন—'চলো কলকাতা যাই। সেখানে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আসি।'

মায়া বাধা দিয়ে বললেন—'কলকাতা যেতে হবে কেন? আজকাল তো কুচবিহারেই ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। চলো কুচবিহারে যাই। তাছাড়া সেখানে গেলে অনেক সুবিধেও হবে। দরকার মতো মা, দাদা-বৌদি সকলেই দেখাশুনা করতে পারবে। এই দেখো দু'হপ্তা মতন অসুখে ভুগছি এর ভেতরেই মেয়ে চারটে খেটে খেটে কেমন রোগা হয়ে গেছে।'

মায়ার কথা যুক্তিসঙ্গত। বিজনবিহারী মেনে নিলেন তাই। বললেন—'তবে চলো কুচবিহারেই যাই।'

দিন দুয়েক পর ওরা কুচবিহার রওয়ানা হলেন।

কুচবিহারে দিনগুলি বেশ হৈ-হুল্লোরের ভেতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে সবার। মায়াদেবী আর ব্যথা টের পান না। তার মন এখন সরস—শরীর সবল।

মা একদিন মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁরে মায়া, তুই তো এখানে এসে বেশ ভালই আছিস মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, মা, ভালই আছি।'

মা ও মেয়ের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মায়ার দাদা সমরবাবু। ওঁদের কথা শুনে বোনের দিকে ফিরে বললেন—'ওখানে তোদের অসুখ না হওয়াই অন্যায়!'

মায়া একটু মুচকি হাসল। মা স্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের পানে।

সমরবাবু বলে চললেন—'একটু নড়াচড়া নেই। কেবল এ ঘর ও ঘর। তোদের চা-বাগানের মেয়েদের একটা স্বতন্ত্র রীতি। কতো সুন্দর ফাঁকা জায়গা—ফাঁকা রাস্তাঘাট ওখানে তবুও কি তোরা ভুলে বার হোস সূর্যের মুখ দেখতে ?

কুচবিহারে এসে মায়ার শরীর সারল। ওষুধপত্রের সঙ্গে বাপের বাড়ির স্নিগ্ধ পরিবেশ। আনন্দ আর তৃপ্তি।

আস্তে আস্তে ফুরিয়ে গেল ছুটির দিনগুলি।

বিজনবিহারী একটা ভাল দিন দেখে রওয়ানা হলেন কর্মস্থল, চা-বাগানে। পথে আবার গাড়ী বদল আলিপুরে। প্লাটফর্মে নামতেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কথায় কথায়

জানতে পারলেন—যে গাড়িতে বাগানে যাবেন সে গাড়ি ক'দিন হলো উঠে গেছে।

বন্ধুটি বললেন তাঁর ওখান থেকে যেতে। রাজী হলেন না বিজনবিহারী।

আলিপুর থেকে বাস চলাচল করে উত্তরে পাহাড়ের গা অবধি। এর মাঝে এক জায়গায় নামতে হবে তাঁদের। অসুবিধার কিছুই নেই। এখন বেলা সাড়ে তিনটে—সন্ধ্যা নাগাদ বাগানে পৌঁছে যাবেন।

মটরের রাস্তা ভাল না। বড়ই অসমান। এ রাস্তায় মটরে নতুন স্প্রীং না থাকলে যেমন ভেঙ্গে পড়বার ভয় তেমনি প্যাসেঞ্জারের শারিরীক স্প্রীংও সুস্থ সবল না থাকলে অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে। মায়ার মোটেই ইচ্ছে নয় বাসে যান।

মায়াকে অনেক বুঝিয়ে সকলকে নিয়ে বাসে উঠলেন। বাস চলতে লাগলো ধূলোর মেঘ উড়িয়ে। অসমতল রাস্তার পাথরগুলি ছুটতে লাগলো তীরবেগে। শুরু হলো স্প্রীং-এর অবিশ্রান্ত কান্না। লোকালয় পেরিয়ে বাস এলো বনের ভেতরে। বনের পশুপাখী ছুটলো ভয়ে। বন পেরিয়ে আবার লোকালয়।

এবারে ড্রাইভার একটা ছোট্ট অপরিসর বাড়ির সামনে গাড়ি থামালে। বললে, এটা তার শ্বশুরবাড়ি। একটা খবর দিয়েই আসছে। কিন্তু গেল তো গেল আর ফেরে না। অনেকটা সময় কাটিয়ে ফিরল।

আবার বাস চলতে শুরু করলে। সেই ধূলো-পাথরের খেলা আর স্প্রীং-এর কান্না। দেখতে দেখতে লোকালয় পেরিয়ে বাস এসে পড়লো গহন শালের বনে।

দূরে আবছা আবছা দেখা গেল রেল লাইন—মটরের রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে সগর্বে।

নিঝুম বন। কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু অরোহীদের গুঞ্জন ও বাসের ঘ্যান-ঘ্যান আওয়াজই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। তখনও অন্ধকার হয়নি। অস্তগামী সূর্যের নিষ্প্রভ কিরণ শালের পাতায় পাতায় ঝিকমিক্ করছে। শুধু রেল লাইনে আর মটরের রাস্তায় অন্ধ কুয়াশার মতো আঁধার নেমেছে। সেখানে সূর্যের রশ্মি নেই। সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে বনস্পতি শাল।

বিজনবিহারী বসে ছিলেন সামনের সিটে, পাশেই তাঁর স্ত্রী ও চার মেয়ে। মেয়েরা গল্প করছে। মায়া মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলছেন—তোরা একটু থাম তো। বিজনবিহারীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই। তিনি তন্ময় হয়ে ভাবছেন সংসারের কতো খুঁটিনাটি।.........ঝি না থাকলে মায়াকে নিজের হাতেই ঘর-সংসারের সব কিছু করতে হয়, বাটনা বাটা থেকে শুরু করে রান্না-বান্না পর্যন্ত। ছোট মেয়ে তিনটি স্কুলে পড়ে। তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় তা মায়া কোন দিনই চান না। তবু তারা যে মাকে একেবারেই সাহায্য না করে তা নয়। তাঁর নিজের ফরমাশও নিতান্ত কম নয়। সে ফরমাশ খাটে মেয়েরাই। ঘরবাড়ি, বিছানাপত্র দিনে দু'তিনবার ঝাড়ঝাঁট দিতে হয়। ফুলদানির জল পালটে দিতে হয় রোজ। ফুল সাজিয়ে রাখতে হয় বেডসাইড টেবিলের ওপর। সিগারেটের টিন, দেশলাই, মসলার কৌটো এ সবও খালি থাকার যো নেই। শুধু কি এই সব? এ ছাড়া অনেক ছোটখাটো জিনিসও গুছিয়ে রাখা চাই—

যেমন কান খোঁচানো পিতলের কাঠি, দাঁত খোঁচানো খড়কে, ছাইদানি।

বড় মেয়েটি বাড়িতেই থাকে সব সময়। সে খাটে মার ফাইফরমাশ। ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছে। অনেক দিন ধরে বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে। মনোমত ভাল পাত্র ও ঘর না পেলে বিয়ে দেন কেমন করে? চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন তাঁর মেয়ের এক বন্ধুর দুর্দশা। কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করছে মেয়েটি। যাক, এবারে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—ভাল একটি ছেলে পাওয়া গেছে। প্রফেসারি করে কলেজে। ভালোয় ভালোয় এক মাস কেটে গিয়ে বিয়েটা হয়ে গেলে বিজনবিহারী বাঁচেন। মায়াও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

বিজনবিহারী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে দু'একটা টান দিতেই শুনতে পেলেন ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ। উৎকর্ণ রইলেন ক্ষণকাল। আর আর আরোহীরাও কান খাড়া করে আছে। সকলেই নির্বাক তাকিয়ে আছে। কোন্ দিক থেকে শব্দ আসছে? কেউ কিছু দেখতে পেলে না। মুহূর্তে ভেসে এলো অজস্র ধোঁয়া ঘন কৃষ্ণমেঘের মত। ছেয়ে ফেলল বন, গাছপালা, রাস্তা-ঘাট। সাথে সাথে দুরন্ত বাতাস। উড়তে লাগল শুকনো শালের পাতা। তার সঙ্গে এলোমেলো বইতে লাগল পাথুরে কুচি-ভরা পথের বালি। শব্দটা যেন হঠাৎ জোর হয়ে কানের মাঝে এসে বিঁধল। আঁধারে আবছা দেখতে পেলেন বিজনবিহারী কী একটা বিরাট দৈত্যের মত এগিয়ে আসছে। তার ভৌতিক কপালে কাচের চোখ জ্বল-জ্বল করছে।

চিৎকার করে উঠল সকলে। বাস থামাও, বাস থামাও, রেল আসছে। ব্রেক চাপতে না চাপতেই বাসের মুখটা এসে পড়েছে রেল লাইনের ওপর। চকিতে কী যেন ঘটে গেল! সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদে কান্নায় ভরে গেল সারা বন।

ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে বাসটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা খাদে।

তারপর? তারপর কি হলো কিছুই তো তাঁর স্মরণ নেই। কে জানে চোখ বুজে ছিলেন কতক্ষণ। চোখ মেলে দেখলেন—দু'একজন যাত্রী ছাড়া সকলেই ছিটকে পড়ে নানা ভঙ্গিতে ছটফট করছে। সামনেই দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। বনস্পতির আহুতি যেন। চেয়ে দেখলেন—সেই পৈশাচিক হোমাগ্নিতে তাঁরই রক্তে তৈরি তিনটি দেহ দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না বিজনবিহারী প্রথমে। তারপর কানে এল শোক-যন্ত্রণাবিদ্ধ অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা, ডাক, ভিক্ষা, কাকুতি। মায়াকে কোলে করে আছে শান্তা। গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এলেন বিজনবিহারী তাঁদের কাছে। চেয়ে রইলেন মায়ার দিকে। আঁতকে উঠলেন রক্ত দেখে। এ যে মাথা ফেটে অবিরল ধারায় রক্ত বেরুচ্ছে! মাঝে একটিবার শুধু তাকিয়েছিল মায়া আগুনের দিকে। তারপর অদ্ভুত, দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে মায়া তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে। কি যেন বলতে চাচ্ছে—ঠোঁট নড়ছে, তবু শব্দ নেই। কখন যেন অলক্ষ্যে নিভে এল চোখের মণি, তা যেন টের পেলেন না তিনিও।

কখন এল রিলিফ ট্রেন। সেই ট্রেন চলল আবার

কুচবিহার। বিজনবিহারীর চোখের ওপর দিয়ে ছবির মত সব কটি দৃশ্য এল, ভেসে গেল। কোনো শারীরিক অনুভূতি নেই। আছে শুধু মন—সেখানে আজ মায়া, আর তিন মেয়ে আর তাদের আগুন-জ্বলা দেহ। সেই অগ্নিশিখা স্পর্শ করছে তাঁর বুকও। বড় বড় শালের গাছ উপড়ে পড়েছে সে আগুনে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

রিলিফ ট্রেন পৌঁছল কুচবিহার। তখন রাত। তারপর রিলিফ ভ্যান, হাসপাতাল। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স। কত রকম ওষুধ, যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজ, তুলো। শুরু হল ইনজেকসন—একটা, দুটো, তিনটে। নাকে এল ঝাঁঝাল ওষুধের গন্ধ। কখন যে চোখ বুজেছেন তা টের পাননি বিজনবিহারী।

কেটে গেল রাত। তারপর সকাল। দুপুর বেলা চোখ মেলে দেখলেন—সামনে দাঁড়িয়ে সার্জন, আর ডাক্তার, নার্স। সকলেরই মুখ ভারী। বিজনবিহারী ম্লান, স্তিমিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন,—'কাকে খুঁজছেন?'

'কাকে?'—কেঁদে ফেললেন বিজনবিহারী। তারপর বললেন এক সময়—'ওঁর কি সৎকার হয়ে গেছে?'

—'না। কেন' বলুন তো?'

'একটু দেখিয়ে নিয়ে যাবেন আমাকে!' আবার কেঁদে উঠলেন বিজনবিহারী ছেলেমানুষের মতন।

কিছুক্ষণ পরে একটা স্ট্রেচারে সাদা কাপড়ে ঢাকা মায়ার দেহ আনা হলো।

'একবার মুখটা খুলে দেবেন? ওকে শেষ দেখা দেখি

একটু।' টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল তাঁর চোখ দিয়ে। অপলক চোখে দেখলেন খানিকক্ষণ। বললেন,—'পরনের কাপড়খানা যদি পালটে দেন। বাসন্তী রঙের একখানা ভাল শাড়ি ছিল ওঁর বাক্সে। সেখানা যদি পরিয়ে দেন।'

কাপড়খানা শেষ পর্যন্ত পরানো হয়েছিল কি না কে জানে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন বিজনবিহারী। কিসের শব্দ হলো। ট্রেনের? না, তিনি চা-বাগানে নিজের বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছেন।

ঘুম কিছুতেই আসছে না। বিছানায় ছটফট করছেন। রাত বুঝি দুটো পার হয়ে গেল। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। কালো মেঘে ছেয়েছে সারা আকাশ। মেঘের ডাক শোনা গেল। এলো বৃষ্টি। পায়ের কাছে কম্বলটি টেনে নিয়ে কখন যে গায়ে দিয়ে চোখ বুজেছেন!

বিজনবিহারী চোখ বুজে আছেন। কে যেন তাঁকে বলছে—দেখেছ, কি আগুনটাই না লেগেছিল। সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। আম-লিচুর বোলগুলি পুড়ে খড়খড়ে হয়েছিল—জল আর বাতাস পেয়েই ঝুর ঝুর করে পড়ে গেছে। কাঞ্চন গাছে আর একটিও ফুল নেই—কলা গাছ ভেঙ্গে পড়ে গেছে ঝড়ে। চা-বাগানে শিরিষের শুকনো শুঁটি আর বাজছে না। সব ঝরে পড়ে গেছে। বেগুন শিম সব নষ্ট হয়ে গেছে শিলে। বৃষ্টি পেয়ে জাম গাছে পিঁপড়ে উঠে ছেয়ে গেছে। কতো যত্নের ফুল বাগান আমার, সব শেষ—।

ফুলবাগানে বসে আরাম করে চা খাওয়াও বন্ধ। ঘাসের

গালিচা কাদা-মাটি মাখা—স্যাঁৎসেঁতে। শুকনো পাতা ভিজে বালি, পচা আম-লিচুর বোলে ভরতি। মাছি পোকা ভন্ ভন্ করছে সবখানে। কে আর ওদিকে যায়? আমার বড্ড ঘেন্না করছে। কে আবার ঘর বাড়ি বাগান সাজাবে গো?

'কেন, তুমি তো আছ'—বলে যেই বিজনবিহারী তাঁর হাত বাড়িয়েছেন বাসন্তী রঙের শাড়ির আঁচল ধরতে অমনি চড়ুইয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখেন—ঘর থেকে বাইরে উড়ে গেল কটা চড়ুই। সামনে দাঁড়িয়ে শান্তা। সকাল হয়েছে।

ব্রাডেন সাহেবের স্মৃতি

নিশ্চিন্দপুরের চরের মামলার অবসান হলো।

নিশ্চিন্দপুর আর তার আশপাশের গ্রামের লোকগুলোর মাঠ ঘাট হাট বাটের গুঞ্জনও থেমে গেছে। এর মধ্যে হঠাৎ নতুন করে আর একটা সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় গুঞ্জনটা আবার মাথা চাগিয়ে ওঠে। এই গুঞ্জনের সঙ্গে পূর্ব গুঞ্জনের সুরতাল ছন্দের সমন্বয় আছে। সে কথা পরে হবে। এখন নতুন সমস্যার কথাই আগে বলি।

এই সমস্যা হল চরের চাষ-আবাদ নিয়ে। মিত্রবাবুরা মামলাতে বিশ্বাসবাবুদের হারিয়ে চাষীদের বললেন চরে গিয়ে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস করতে আর চরের জমি আবাদ করতে। চরের শুকনো নিরস বালুতে শুধু চরো ঝাউগাছগুলোই পত্তনি নিয়ে সগর্বে একমাত্র দখলিকার ঘোষণা করছে আজ দীর্ঘ চার বছর ধরে। এই ঝাউগাছগুলো মূলসমেত উপড়িয়ে ফেলে জমি চাষের যোগ্য করা সহজসাধ্য নয় তাই বসতবাটির জন্য চাষীদিগকে দুবিঘে নিষ্কর জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা। কিন্তু কৃষকদের কেউ রাজী হল না। অবশ্য তাদের এই গররাজী হওয়ার কারণ ঐ ঝাউগাছ বা বেলে জমি নয়। এর কারণ হচ্ছে ওরা চরে যেতে ভয় পায়।

ওদের কেউ বলে—চরে গেলে, একা একা পেলে, কে নাকি একটা হ্যাটকোট পরা লোক ভেংচি কাটে, কেউ বলে

গাউনপরা একটা স্ত্রীলোক হো হো করে হাসে। আবার অনেকে বলে—খড়ম্ পায়ে কে একজন পৈতাধারী, পরণে গেরুয়া বসন কাঁধে হরিনাম লেখা নামাবলি, চেঁচিয়ে বলেন—এসো না, খবরদার!

এখন নিশ্চিন্দপুরের চরের মামলার কথাটা বলি। নিশ্চিন্দপুর নামে একটা গ্রাম। ওপারে নিশ্চিন্দপুর, এপারে ডুমাইন। মাঝখানে গড়াই।

চার বছর আগে সারা নিশ্চিন্দপুর গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লোক নেই, মাটি নেই। সেখানে শুধু গড়াইয়ের জল থই থই করছে।

নিশ্চিন্দপুর ছিল ডুমাইনের বিশ্বাস বাবুদের। ওখানকার মাটি এসে জমাট বাঁধল ডুমাইনের সামনে,—একেবারে ঐ গ্রামেরই মিত্রবাবুদের জমির সামনে।

বিশ্বাসবাবুরা বললেন—এই চর আমাদের। কারণ আমাদের জমি ভেঙে এই চর পড়েছে। আর মিত্রবাবুরা বললেন—এই চর যখন আমাদের জমির সামনে পড়েছে তখন এটা আমাদের। এই সূত্র ধরেই শুরু হল বচসা, ঝগড়া তারপর সেটা রূপায়িত হয় মারামারি কাটাকাটি এবং সর্বশেষে মামলাতে।

এখন নিশ্চিন্দপুরের পূর্ব ইতিহাসটা একটু বলি। এই নিশ্চিন্দপুরে ছিল নীল চাষ। ব্রাডেন সাহেব ছিলেন এসবের স্বত্বাধিকারী।

এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ ব্রাডেন সাহেবকে কে না চিনতো এ তল্লাটে? কতো রক্তগঙ্গার স্রোত বয়েছে এখানে—এই নিশ্চিন্দপুরে, কতো আগুন জ্বলেছে আবার কতো হাসির

ঢেউ ব'য়ে গেছে নীরব পাষাণ বুকে। এ সবই তো তার কাণ্ড।

কালস্রোতে সব ভেসে যায়। এ হেন ব্রাডেন সাহেবকেও একদিন এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো। নিশ্চিন্দপুরের নীল চাষও নিশ্চিহ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু সব কি নিশ্চিহ্ণ হয়? মাটিতে যে তার দাগ কাটা থাকে তাই সকলে ভুলতে চাইলেও মাটি ভুলতে দেয় না। মাটি অতীতের গান গায় আর তার সেই গান লোকের মনে গুঞ্জন তোলে।

ব্রাডেন সাহেবকে যে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হলো সেও একটা বিরাট কাহিনী।

ওপারে নিশ্চিন্দপুরের লাগোয়া নাকোল ও কম্মুদ্দি গ্রাম আর এপারে ডুমাইনের লাগোয়া ভৌমিকনগর আর লক্ষ্মীপুর। ভৌমিকনগরটা ছিল ভূঁয়েদের এবং ওদেরই নাম থেকে গ্রামটার নামকরণ হয়েছিল। এসব নাকি অনেক আগের কথা। মামুদপুরের সীতারাম রায়ের সময়ের। এই নামটি তিনিই দিয়েছিলেন। এর আগে ভৌমিকনগরের নাম ছিল মণ্ডলপুর। প্রবাদ আছে সীতরাম রায় প্রায়ই তার রাজ্যমধ্যে চক্কর দিতেন। সঙ্গে নিতেন হাজার হাজার কোড়াদার, এবং যখন যেখানে জলের অভাব দেখতে পেতেন তখনই ঐ কোড়াদারদের দিয়ে দীঘি অথবা পুকুর খনন করতেন। এছাড়া আরো একটা বিস্ময়কর প্রবাদ আছে। তাঁকে নাকি গুপ্তধনে ডাকত। সে একবারকার কথা। তিনি যাচ্ছিলেন মণ্ডলপুরের ভেতর দিয়ে। সঙ্গে অনেক কোড়াদার। হঠাৎ সেখানে একজন বিধবা বৃদ্ধার কুঁড়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়ান তিনি। বুড়ির রান্নাঘরের চালে লতিয়ে

উঠেছে একটা লাউগাছ। লাউগাছটি বাতাসে দোল খাচ্ছিল। তার লকলকে ডগাগুলোকে মনে হচ্ছিল কার যেন শ্যামবাহু! ইশারায় ডাকছে কাকে! বুড়িকে বললেন—আপনার এই লাউগাছটি কিনতে চাই। কত দাম চান? বুড়ি অবাক হয়েছিলেন—একথায়। বুড়িকে দশ টাকা দিয়ে গাছটি কিনে নিলেন সীতারাম। অঢেল ঐশ্বর্য পেলেন ঐ লাউগাছটির গোড়ায়।

এই বুড়ি ছিলেন দে বংশের বউ। তাঁর একমাত্র ছেলে রামদাস। কুড়ি বাইশ বয়স হবে তখন তার। বিয়ে-থা করেনি। করবারও কথা নয় কারণ তখনকার দিনে ছেলে-দের বিয়ে সাধারণতঃ ত্রিশের নিচেয় হতো না। অবশ্য মেয়েদের হতো অল্প বয়সেই। আট বছরে অথবা তারও আগে। একে বলতো গৌরীদান। সে সময়কার লোকেরা পেত দীর্ঘজীবন। ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্ কাউকেই অকাল পক্কতার ধার দিয়ে যেতে হতো না।

যাক্, এ সমস্ত কথা থাক। এখন আবার আগের কথায় ফিরে আসি। সীতারাম তার রাজধানী মামুদপুর ফিরে গিয়েও লাউগাছটির কথা, বুড়ির কথা, রামদাস ও মণ্ডলপুরের কথা ভুলতে পারেননি।

এই ঘটনার একমাস পরেই সীতারাম রামদাসকে একটা জায়গীর উপঢৌকন দিয়ে সনদ পাঠান এবং তাঁর রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, ঘোষণার এই তারিখ থেকে মণ্ডলপুরের নাম হলো ভৌমিকনগর আর এখানকার রামদাসকে প্রদত্ত করা হলো ভৌমিক উপাধি। এই থেকেই ভৌমিকনগরের উৎপত্তি।

এই ভৌমকনগরের এদেরই বংশধর গোবিন্দ ভুঁয়ে। এই গোবিন্দ ভুঁয়েই ছিলেন ভুঁয়ে বংশের ভেতর প্রভূত প্রতিপত্তিশালী। এঁর আগে এবংশের কোন জাতকের তেমন একটা তেজ বা তাপ-রাগ ছিল না। তাঁদের রক্তে তখনও পূর্বপুরুষদের হিমশীতল রক্তের মিশ্রন ছিল। পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। শেষে সতেজ, সক্রিয়, বলিষ্ঠ মন ও নতুন টাটকা টগবগে রক্ত নিয়ে জন্ম নিলেন এই গোবিন্দ ভুঁয়ে।

এ হচ্ছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়কার কথা। ব্রাডেন সাহেবের বাবা এসে এই নীল চাষ সুরু করেন নিশ্চিন্দপুরে। তিনি দাপটের সঙ্গে কাটিয়ে যান দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর। তারপর তাঁর মৃত্যুর পরে ইয়ং ব্রাডেনের কাল আরম্ভ হলো।

লোকে বলে বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া। ঠিক তাই হলো, ইয়ং ব্রাডেন তার বাবার সমস্ত ভালো মন্দটুকুই পেলেন। কিন্তু বাবা যেমন তাঁর সারা জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পেরেছিলেন ইয়ং ব্রাডেন তেমনটি পারলেন না। গড়াইয়ের ঠাণ্ডা জল হঠাৎ একদিন আগুণ হয়ে ওঠে। সে আগুণে ব্রাডেন সাহেবের ছিপগুলোর কাঠ ফট্‌ফট্ আওয়াজ করে করে পুড়তে লাগল।

চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

এই আগুন লাগিয়েছিল গোবিন্দ ভুঁয়ে।

সকলেই স্তম্ভিত হয়। এ কী কম দুঃসাহসিকতার কাজ? গড়াইয়ের নীলচে জলে ছিপ ভাসিয়ে চলছিলেন ব্রাডেন সাহেব। সঙ্গে ভৌমিকনগরের নেপাল মণ্ডলের বোন সুন্দরী। সন্ধ্যাজলের শান্ত ঢেউ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৃদু গান।

ছিপখানি একটু একটু দোল দিয়ে ওঠে। ওদের দেহ নড়ে। উভয়েই তন্ময় হাসে।

এ সংবাদ দেখতে দেখতে রটে গেল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

গোবিন্দ ভুঁয়ে নিস্পন্দ হিমালয় হয়েছিলেন ক্ষণকালের জন্য। তারপর একটুক্ষণ বাদেই অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন।

মুহূর্তে গড়াইয়ের শান্ত জলে একটা উত্তাল তরঙ্গ প্লাবন দেখা দিল। নতুন জীবনীশক্তি পেয়েছে গোবিন্দ ভুঁয়ে আর তাঁর লোকজন। অনেকের হাতেই মশাল। নীলচে জল আগুনে হয়ে ওঠে। বিস্ময় গোণে নদীর দুধারের লোকগুলো।

ব্রাডেন সাহেব নিঃসহায়। গোবিন্দ ভুঁয়ের কাছে মাফ চেয়ে হাতে হাত মিলিয়ে নিভন্ত মশালের ধুঁয়োটে জলের অন্ধকারে গা ঢেকে ফিরে গেলেন তাঁর কুঠিতে।

এরপর থেকেই মনে মনে নতুন শক্তির সঞ্চার হয় এ দেশের লোকগুলোর। রক্তে একটা নতুন প্লাবন দেখা দেয়। রুখে দাঁড়ায়, চোখ উঁচু করে কথা বলে তারা। এ খবর ব্রাডেন রাখেন।

এদেশের লোকগুলো কেউ আশা করতে পারেনি এমন একটা অঘটন ঘটতে পারে, এ যে বিশ্বকর্মারও অবিদিত!

হঠাৎ একদিন রাত্রে ছিপে ছিপে ছেয়ে গেল গড়াইয়ের জল। সকলেই প্রমাদ গণলো। ব্রাডেন সাহেব নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে ভেসে আসবে বন্দুকের আওয়াজ, কালান্তরের হি হি, রি রি বীভৎস রব। গড়াইয়ের নীল জল গোলা

বারুদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠবে, কালনাগের মত ফেঁপে উঠবে রোষে। পরক্ষণেই ওরা বুঝতে পারে তারা যা ভেবেছে তা ঠিক নয়। ঐ যে ছিপগুলো চলে গেল বহুদূরে। তাহলে আর কি হতে পারে?

এ অবশ্যই ব্রাডেনের নীল চালান।

পরদিন সকালে সকলেই বিস্মিত হলো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এ তল্লাটের লোকগুলো। ব্রাডেন সাহেব প্রতিশোধ নেবার জন্য কি নীল চালান দেবার জন্য ছিপ চালাননি। ছিপগুলোতে ছিল তাঁর মালপত্তর।

ব্রাডেন এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জমিদারি আর প্রাসাদতুল্য কুঠি এ সবই কিনলেন ডুমাইনের বিশ্বাসবাবুরা।

ত্রিশ বিঘা জমির ওপর এই কুঠি। লাগোয়া একটা চক মিলান বাগান বাড়ি। তার মধ্যে ঘাটবাঁধা পুকুর, জলে লাল, নীল পদ্ম। পাড়ে দেশি-বিদেশী ফুল-লতাগুল্মের গাছ। প্রাঙ্গনের ভেতরে ভেতরে এলোমিনিয়ম পেণ্ট করা লোহার পোষ্ট। তাতে সন্ধ্যা হলেই জ্বলে ঝাড় লণ্ঠন। তার উজ্জ্বল শান্ত রশ্মি গিয়ে লুটিয়ে পড়ে গড়াই ও পুকুরের নীলচে জলে। বিচিত্র হেসে ওঠে পুকুরের পদ্ম। নদীতে হাল, দাড় বইঠা হাতে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে নৌকার মাঝিমাল্লা। মনের কোণে বিরহের আনন্দ বেদনা মিশ্রিত কত ছোট বড় অতীত ঢেউ এসে জট পাকায়।

এই বিচিত্র সন্ধ্যা কে না দেখেছে এ গেরদের লোকে? বিশ্বাসবাবুরাও কতবার মুগ্ধ হয়েছেন এ পরিবেশ দেখে, কত সাধ জেগেছে মনে, কত স্বপ্ন দেখেছেন—বিশাল কুঠি,

চকমিলান বাগান বাড়ি, ঘাটবাঁধা পুকুর, তার নীল জল, লাল নীল পদ্ম, দেশি বিদেশী ফুল লতাগুল্ম !

কুঠির রঙ ফিরানো হচ্ছে।

গ্রামের একজন শতবর্ষ বয়স্ক প্রাচীনতম বৃদ্ধ এই তোড়-জোড় আয়োজন দেখে খুশি হতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাসদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেনবাবুকে বললেন ছাখো সুরেন, সাহেবের কুঠিতে আর যেও না। যেখানে আছ ঐখানেই থাক। খুশি হয় ঘর-দুয়োর আরো ভাল করে পাকাপোক্ত করে নেও। বিধর্মী ম্লেচ্ছের কুঠি কি আমাদের সনাতন ধর্মের রক্তে সইবে ? এখনো চোখের ওপর জ্বল জ্বল ভেসে ওঠে ঐ কুঠির ও চক্‌মিলান বাগানবাড়ির কত অনাচার অত্যাচার, অবিচার ! কত নির্মল নারীচরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে ঐ ব্রাডেন সাহেব। তাদের অভিশাপ কোথায় যাবে ? এইজন্যই তো মেমসাহেব গলায় দড়ি দিয়েছিল। তারপর ওদের না আছে শ্রাদ্ধশান্তি, না আছে পিণ্ডদান। তাহলে এই অপমৃত্যুতে যে ভূতপ্রেত হবে না—এ বিশ্বাস কে করবে ?

শেষ পর্যন্ত কুঠিতে গিয়ে বসবাস করা ঠিক হয়। পুরোহিত রাম চক্রবর্তী বললেন, শাস্ত্রমত শান্তিসস্ত্যয়ন করে গৃহপ্রবেশ করলে ঘরের দোষ থাকে না।

শান্তি সস্ত্যয়ন, নারায়ণ ও শনিঠাকুরের পূজো সেদিন। কুঠিতে স্ত্রী-পুরুষের সমাগম। একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রাঙ্গনের বড় বড় ঝাউগাছের পাতার ঝিরঝিরে বাতাসের তালে তালে প্রাণমাতানো গানের সুরে তাথৈ তাথৈ নেচে ওঠে। পুকুরের

জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে একতাল। লাল নীল পদ্মগুলোর কী উদ্দাম, মাতামাতি। মনগড়া স্বপ্নের পরিবেশ। সকলেই তন্ময় হয়ে দেখছে, তারা তো এর আগে কুঠির ভেতরটা এমন খোলামেলা ভাবে দেখতে পায়নি কোনদিন।

সুরেনবাবুর স্ত্রী সুষমা উপস্থিত স্ত্রীলোকদিগকে একটা কুঠুরি দেখিয়ে বললেন—এই ঘরটা সাহেবের ডাইনিং হল ছিল। এটাতে ওরা খানা খেত। আমি মনে করছি এখন থেকে আমরা খানা খাব এখানে। একটু মুচকে হাসলেন সুষমা। হেলে পড়েন ডান পাশের সঙ্গিনীর গায়ে। আর আর সকলে ও সে হাসিতে যোগ দেয়।

কারো আনন্দ, কারো ঈর্ষা। যারা খুশি হয়েছে তারা বলে, এবারে যাহোক মেয়েছেলেরা নির্ব্বিবাদে পথেঘাটে বেরোতে পারবে। যাদের ঈর্ষা হয়েছে তারা সেকথা ভাবে না। তারা ভাবে এসব পাওয়ার মূলে ছিলেন গোবিন্দ ভূঁয়ে। এই কুঠি জায়গা জমি সবই তাঁর পাওয়া উচিত ছিল। তিনিই তো দুর্ধর্ষ ব্রাডেনকে তাড়িয়েছেন এদেশ থেকে, বিশ্বাসেরা আর কি করেছেন। গোবিন্দ ভূঁয়ে তো তাঁর সব ক্ষুইয়েছেন এই নীলকুঠিগুলোর সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করে করে। পরগত প্রাণ ছিল তাঁর। কেউ অস্বীকার করতে পারে না এ কথা।

হোম-যাগ-যজ্ঞ করে বিধিমত সমস্ত পূজোগুলোই হয়ে গেল রাত ন'টার মধ্যে।

ওপারে ডুমাইনেও বিশ্বাসদের বিরাট বাড়ি, প্রচুর মাল-পত্তর। নীলকুঠিতে এখনও সে সমস্ত গোজগাজ করে আনতে পারেননি তাঁরা। পুরোহিত ঠাকুর বিধান দিলেন

আজকার রাতে শুধু বড়ভাই সুরেনবাবু কুঠিতে রাত্রি যাপন করলেই চলবে। তারপর কালও ভালদিন আছে গৃহ প্রবেশের। আর আর সকলে কাল এলেই হবে।

পরদিন ভোর না হতেই সারা ডুমাইন গ্রামটিতে একটা বিরাট হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রত্যেকের মুখে একই কথা—ঐ কুঠিতে নিশ্চয়ই ভূতপ্রেত আছে।

তখনও অবছা আবছা অন্ধকার। পুরোহিত ঠাকুর রাম চক্রবর্তীর স্ত্রী সরলা কেবল দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়েছেন অমনি আম গাছের ভেতর থেকে কাঁ কাঁ করে ডেকে ওঠে একটা কাক। কাকের এই কর্কশ ডাক তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে প্রাণটা কেঁপে উঠছিল বার বার।

এরমধ্যে ঘাটে এসে ভিড়ল একটা ছিপ। ও কি, কাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে ছুটিলোক? সরলা একটু এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তে সব শূন্য দেখলেন তিনি।

দেখতে দেখতে বাড়ি ভরে গেল লোকজনে। এদিকে বেলা ও বাড়ল। রাম চক্রবর্তীর চোখে মুখে তখনও একটা ভীতির ছাপ তবে ছ'চারটে কথা বলছেন। রাতের ঘটনা এর আগে তিনি কাউকে বলতে পারেননি। বললেন, ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাঁর গলা টিপে ধরল। একটা অশরীরী মেয়েলি কথা শুনতে পান—এখানে এসেছিস কেন? জানিস নে, এ আমার বাড়ি? তিনি কিছুই বলতে পারেননি এর জবাবে। তারপর সেই অশরীরিণী তাঁর বুকের ওপর পা চাপা দিয়ে গলা টিপছে

লাগল। বলতে বলতেই রাম চক্রবর্তীর চোখ উল্টে যায়। সজোরে চীৎকার করে বলে উঠলেন—ঐ ঐযে, আবার আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জীবন কবিরাজকে ডেকে পাঠান সুরেনবাবু। কবিরাজ যখন এলেন তখন তাঁর নাড়ীর স্পন্দন নেই।

রাতের ঘটনার যে ইতিহাসটুকু রামচক্রবর্তী বললেন সে তো শুধু তিনি যা জানতেন। এখন তাঁর অজ্ঞান অবস্থায় যা যা ঘটেছিল তাই বলছি। এ ঘটনা জানতেন সুরেনবাবু আর তার চাকর বনমালী। সুরেনবাবুর কাছেই সেসব কথা শোনা।

পূজোর পর রাত্রেই সকলে ফিরে গেলেন ডুমাইনের বাড়িতে। কুঠিতে রইলেন শুধু সুরেনবাবু, পুরোহিত ঠাকুর রামচক্রবর্তী, আর বনমালী।

নির্জন প্রান্তরের মধ্যে একটা বিরাট প্রাসাদতুল্য কুঠি আর কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। এই ছোট ঘরগুলোতে থাকত ব্রাডেনের চাকরবাকর। ব্রাডেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ও তাদের নিজ নিজ দেশে চলে গেছে। আর ঘরগুলিও খালি পড়ে আছে।

দক্ষিণের যে ঘরটিতে ব্রাডেন থাকতেন সেই ঘরে শুয়ে ছিলেন সুরেনবাবু, তার পাশের ঘরে বনমালী আর তার পরেরটিতে রামচক্রবর্তী। সমস্ত ঘরগুলোর দরজা খোলা। ঘরগুলোর সামনে রেলিং দেওয়া প্রশস্ত বারান্দা। তাতে একটা টিমটিমে লণ্ঠন।

রাত তখন একটা। সুরেনবাবুর কিছুতেই ঘুম আসছে না।

কত স্বপ্নের জাল বুনছিলেন মনে মনে তিনি। এদিকে নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে রামচক্রবর্তী ও বনমালীর। নিঝুম পুরীতে শুধু ঐ নাকের ডাকই জনমানবের সাড়া দিচ্ছিল। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ ভেসে আসে। উৎকর্ণ রইলেন সুরেনবাবু। কতকটা ভয়, কতকটা বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। একটানা শব্দ, ছেদ নেই তার। মনে পড়ে গ্রামের সেই শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের কথা। এরপর নিজেকে সামলিয়ে নেন সুরেনবাবু। সাহসে ভর করে বারান্দায় গিয়ে লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে বনমালীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে—বনমালী, বনমালী করে অনেকবার ডাকলেন। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বনমালীর দেহ অবশ। তার সাড়া পাওয়া গেল না। তাকে আর ডাকলেন না। শব্দ আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন রাম চক্রবর্তীর ঘরের দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন রামচক্রবর্তীকে। কোন সাড়া নেই অথচ শব্দ আসছে তাঁরই ঘর থেকে। শব্দ আরো ঘন ও বিকট। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও কিছু নেই। লণ্ঠনটি হাতে ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন পুরোহিত ঠাকুর রাম চক্রবর্তী গোঙাচ্ছেন আর তাঁর মুখ থেকে অনর্গল ফেনা নির্গত হচ্ছে। সজোরে একটা আর্তনাদ করে ওঠেন সুরেনবাবু। সেই আর্তনাদে ঘুম ভেঙ্গে যায় বনমালীর।

বনমালী গিয়ে হাজির হতেই সুরেনবাবু বললেন— শিগগির করে জল নিয়ে এস।

বারান্দায় বড় একটা বালতি ভরতি জল। বনমালী সেই জল নিয়ে এল। চোখেমুখে মাথায় অনেক করে

জল দেওয়ার পর রাম চক্রবর্তীর জ্ঞান হয়। চোখ দুটো বড় করে খানিকক্ষণ চেয়ে ছিলেন সুরেনবাবুর পানে। তারপর কম্পিত দেহে এদিক সেদিক তাকিয়ে বিছানায় বসতে যান। সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি ওঁকে শুইয়ে দিলেন। কি যেন বল্‌তে চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু সুরেনবাবু বারণ করায় নীরব রইলেন।

এরপর ভোর হয় তারপরই তো সুরেনবাবু রাম চক্রবর্তীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন। শেষে যে অঘটন ঘটলো তাতো সবাই জানে, আগেই বলা হয়েছে।

এই ঘটনার পর থেকে বিশ্বাসবাবুরা কুঠি-সংক্রান্ত সমস্ত পরিকল্পনাই পরিত্যাগ করলেন। যেমন কুঠি তেমনি পড়ে রইল। কুঠিতে এখন আর কেউ পাহারা দেয় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে করে এক যুগ অতীত হলো কুঠির একটুকরো খড়ও কেউ নেয় নি। কুঠির কত ইট ধ্বসে পড়েছে, কেউ তার খোঁজ রাখে না। দূর থেকে চেয়ে দেখে কুঠির ধ্বংস চলেছে। দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে শিকড় ছেড়েছে কত অগাছা কুগাছা। দেখলে মনে হয় বড় বড় সাপ জড়িয়ে রয়েছে কুঠির গায়ে গায়ে।

দেশের সবাই ভয় পেয়েছিল কিন্তু ভয় পায়নি একজন। সে গড়াই। চারদিন চাররাত্রের মধ্যে সে ব্রাডেন সাহেবের সকল স্মৃতিই চুরমার করে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে তার জঠরে পুরলো। তল্লাটের লোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

এরপরই এই চর পড়ে। তারপর হয় মামলা। এই মামলা চলে পুরো দশ বছর। আগে যা বলেছি সে তো

মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় আগের কথা। কিন্তু মামলার এই দশ বছর সময়ের মধ্যে যা যা ঘটেছে তাই বলছি এখন।

বচসা কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়েই দৃঢ় প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষই রীতিমত তৈরি হলো। এ গেরদের যত লাঠিয়াল সকলেরই কদর বাড়ল। তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন পক্ষে যোগ দিল।

রুদ্র বৈশাখের একটা দিন। ভোর না হতেই বিশ্বাস বাবুরা চরে নামিয়ে দিলেন ঘরতৈরির মালমসলা সমেত অনেক লোকজন আর তার সঙ্গে ঢাল সড়কি হাতে অগুণতি লাঠিয়াল।

তাদের বীভৎস তাণ্ডব নৃত্যে ও গীতে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস। এসংবাদ মিত্রবাবুদের কানে পৌঁছতেই বিশ্বাসবাবুদের ঘরবাড়ি তৈরির কাজে বাঁধা দেওয়ার জন্যে নামিয়ে দিলেন তাঁদের লোকজন ও লাঠিয়াল। দু'দলে দারুণ সংঘর্ষ হয়। একটা নবতম কুরুক্ষেত্রের উদ্ভব হলো।

এদিকে বেলা বাড়ল। সুরু হলো রুদ্র বৈশাখের মাতলামো। চরের নিরস বালু আগুনে বাতাসের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত উড়তে লাগল। গড়াইয়ের জল ঢেকে গেল চরো বিন্নি, ঝাউ গাছে আর তার পাতায় পাতায়।

শেষ পর্যন্ত এই নবতম কুরুক্ষেত্রের রণে বিশ্বাসবাবুদের দু'জন লাঠিয়াল হত এবং দশ বারোজন আহত হয়।

মিত্রবাবুদের তরফের পনেরো ষোলজন অল্পবিস্তর আঘাত পেয়েছে।

এরপর লড়াই থেমে গেল। কোর্টে কেস ফাইল করলেন বিশ্বাসবাবুরা। দু'জন লাঠিয়ালের মৃত্যুতে তাঁদের একটুকুও

. দুঃখ নাই। অঢেল টাকা আছে। মৃতের স্ত্রী পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ভার না হয় নেবেন তাঁরা কিন্তু সাজা তো হবে মিত্রদের।

মামলার পূর্বদিনের সন্ধ্যার কথা। মিত্রমশায়রা দুইভাই বারান্দায় বিষণ্ন মনে বসে। নিকটে গোমস্তা নিবারণ দাস দাঁড়িয়ে। নিবারণকে সমস্ত বুঝিয়ে দিচ্ছেন—জমিজাতীর, বাড়ীর পরিবারবর্গের সব ভার তার ওপরে থাকল। তাঁদের জেল অনিবার্য। দুই ভাই-ই নতমুখে নীরব ছিল। এর মধ্যে একজন ফকির এসে দাঁড়াল উঠানে। বিরাট তার দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গাল ভরতি লম্বা লম্বা দাঁড়ি, গোফ। দু'ভাই তখনও নির্বাক। ফকিরই প্রথম কথা কইল। সে বড়ভাই ব্রজেশ্বরের পানে চেয়ে বলল—আজকার রাতটা একটু থাকার জায়গা দেবে এখানে? বিস্ময় জাগে মনে। সন্দেহ হয়। তবে কি এসব বিশ্বাসদের কাজ? বোধহয় চর পাঠিয়েছে ওরা এদের ভেতরের খোঁজখবর নিতে! ছোট ভাই কাশীশ্বর বড় ভাইয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে!

ফকির ক্ষণকাল চোখ বুজে কী একটু ভাবল। তারপর বলল—তোদের মাথার ওপর মস্ত বড় বিপদ?

বিস্ময় ছাপিয়ে ওঠে দু'ভায়ের চারচোখে। ব্রজেশ্বর ভক্তি শ্রদ্ধায় বিনম্র হয়ে পড়ে কিন্তু কাশীশ্বরের সন্দেহের ঘোর কাটেনি। সে ভাবে আশপাশের গ্রামগুলোর এমন কি ফরিদপুর জেলার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে কে না জানে তাদের মামলার কথা?

[illegible] [illegible] জানিয়ে বলল—আপনি সর্বত্যাগী [illegible] [illegible] মত মহৎ লোকের পদধূলি এই বাড়িতে পড়েছে—এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কাশীশ্বর চলে গেল।

ব্রজেশ্বর বাঁধোবাঁধো গলায় বলল—আমরা কায়েস্থ।

ফকির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল—যে ফকির তার কাছে হিন্দু মুসলমান, মুচি ডোম সবাই এক। মানুষ—মানুষ। ভগবানের সন্তান। আমি সবার রান্নাই খেয়ে থাকি।

এরপর খানিকক্ষণ চোখবুজে ধ্যানস্থ ছিল ফকির। শেষে ব্রজেশ্বরের দিকে একটা তীক্ষ্ণ গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—কাল বুঝি তোদের মামলার দিন? সারা দেহটা তার কেঁপে উঠল।

এদৃশ্য দর্শনে ব্রজেশ্বর ভীত হয়ে ওঠে। নাড়ীর সমস্ত স্পন্দন যেন মুহূর্তে নিস্ক্রিয় হলো। চোখ দুটো নিষ্প্রভ।

ফকির হেসে বললে—ভয় নেই। আমার কাছে আয়।

ব্রজেশ্বব যন্ত্রচালিতেব মত ফকিরের নিকটে গিয়ে বসলো। বাক্যহীন সে। প্রাণের কোন জিজ্ঞাসাও নেই।

ফকিব তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। ব্রজেশ্বরের সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গে একটা শিহরণ জাগে। প্রতি রোমকূপ মাথা উঁচু করে উঠল।

ফকির বলল—তোরা মামলায় জয়লাভ করবি। আমি বলছি—তোরা জয়ী হবি। ফকিরের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের একটা ঝিলিক খেলে গেল।

ব্রজেশ্বরের নির্জীব জীবন সবুজ হয়ে ওঠে। সে আসন ছেড়ে উঠে ফকিরকে প্রণাম করল। বাক সরলো না।

ব্রজেশ্বরের স্ত্রী কমলা ওদের কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকে লক্ষ্য করে ফকির বলল—বড় ঘরের বাস্তখুঁটির চারিপাশ ভাল করে লেপেপুছে পরিষ্কার কর মা। ধূপধুনা দাও। একটা মেটেপাত্র ভরতি জল আর একটু কলার পাতায় কয়েকটা সাদা ফুল রাখ। পুবমুখো দুটো আসন পেতে রেখো।

ফকিরের নির্দেশ মত সব ব্যবস্থাই হলো। এবারে ফকির কমলাকে বলল—তোমরা কেউ এই ঘরের দিকে এসো না।

ফকির ব্রজেশ্বরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। একটা আসনে বসে অপরটিতে ব্রজেশ্বরকে বসতে বলল। এর আগেই ফকির ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ব্রজেশ্বর ভয়ে ভয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত রেখে কি যেন বিড়বিড় করে বলল ফকির! কি যে বলেছিল ফকির সে সমস্ত খেয়াল করবার মত অবস্থা তার ছিল না সে সময়। সে তখন ভিন্ন জগতের লোক। ফকিরের পানে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছিল শুধু। এরপর ফকির কখন যে কি করেছিল তা সে টের পায়নি। অপর কেউও সে খবর জানে না। ফকিরও কারো কাছে বলেনি কিছু।

দু'ঘণ্টার ওপর ব্রজেশ্বর একই অবস্থায় ছিল। শেষে আচমকা একটা পলকে সম্বিৎ ফিরে পেল। দেখতে পেল তার মাথায় ফুঁ দিচ্ছে ফকির।

ফকিরের মুখে একটা চটুল হাসি। বলল—যা, তোদের সব বিপদ কেটে গেছে।

সারা ঘরটিতে সুরভিত ধূপ চন্দনের গন্ধ। এতক্ষণ সে গন্ধ অনুভব করতে পারেনি ব্রজেশ্বর। নাকের রন্ধ্র যেন বন্ধ ছিল তার। সকল ইন্দ্রিয়গুলো বিকল ছিল। এবারে ফিরে পেল অনুভূতি। নাকে ধূপচন্দনের গন্ধ পেল। প্রাণে একটা অপূর্ব স্পন্দন অনুভব করল। এরপর সে যা দেখতে পেল তা সে ভুলতে পারে না। সে ছবি তার মনে একটা অপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আবার কি অমনটি হবে, আর কি সে তাঁকে দেখতে পাবে? সে যে প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। কী যে সে অপরূপ! উজ্জ্বলবরণ শ্যামা মায়ের সেই অভয় বাণী—মা ভৈ, মা ভৈ!

এ সব কথা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কমলাকে বলেছিল ব্রজেশ্বর।

দাঙ্গার দিন থেকে এ পর্যন্ত ব্রজেশ্বর দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। আজ তার চোখ দু'টোতে কে যেন ঘুমের অঞ্জন লাগিয়ে দিয়েছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে। কমলার কিন্তু ভাল ঘুম হয়নি। একটা অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস তাকে যেন বারে বারে ভাবসমুদ্রে তলিয়ে দিচ্ছিল।

সকাল না হতেই সারা বাড়িতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল।

আঁধার আঁধার ভাব থাকতেই বিছানা থেকে উঠে গেল কমলা। ফকির যে ঘরটিতে ছিল সেটার দিকে তাকাল একবার। অবস্থা আঁধারে ভাল দেখতে পেল না। মনে হলো দরজাটা খোলা। একটু এগিয়ে গেল,—সত্যি দরজাটা খোলা। ভাবল, ফকির হয়তো বাহ্যপ্রসাব করতে গিয়েছে। কমলা সকালের খুঁটিনাটি কাজকর্ম করে চলেছে।

এদিকে সকাল হলো। নারকেল সুপারি গাছের চিকণ পাতাগুলো প্রভাত সূর্যকিরণে ঝক্ঝকিয়ে উঠল। ফকির তখনও ফিরেনি। কেমন একটা সন্দেহের আচ লাগে মনে। এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল—এত সময় লাগবে কেন বাহ্য-প্রসাব করতে? ভয়ে ভয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভাল করে দেখে নিল। না, বাহ্যপ্রসাব করতে তো যায়নি, ওই তো গাড়ূটা যেখানে সে রেখেছিল সেখানেই রয়েছে। উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে গিয়ে ব্রজেশ্বরকে ডেকে তুলল। তারপরেই বাড়িময় হৈ চৈ পড়ে গেল। তন্ন তন্ন করে খুঁজল ফকিরকে কিন্তু তাকে কি আর পাওয়া গেল?

সারা বাড়িটাতে একটা বিষণ্ণতা থমথম করছে। মামলার দিন। সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কোন রান্নাবান্না হয়নি। সকলেই অভুক্ত। ছেলেপেলেগুলোকে শুধু চিড়েমুড়ি খাইয়ে রেখেছে।

রাত তখন আটটা হবে। কে যেন ঘোড়া চালিয়ে যাচ্ছে বড় সড়ক দিয়ে। ঘোড়ার খুরের ঠুক্ঠুকানি ভেসে আসছে। কমলা ঝাঝরা বুকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠানে।

নিবারণ গোমস্তা এসেছে ঘোড়ায়, খবর নিয়ে। আর আর সকলে পিছনে আসছে। মামলা ডিসমিস হয়েছে। সকলেই বেকসুর খালাস।

এই শেষ নয়।

এই তো গেল ফৌজদারী মামলা। এরপর সুরু হলো দেওয়ানী মামলা।

গাঁয়ের দাসেদের সঙ্গে ব্রজেশ্বরদের আগের থেকেই মন কষাকষি ছিল। তেমন একটা বড় কিছু নিয়ে নয়। সেটা

হলো কে বড়, কে ছোট এই নিয়ে। বিশ্বাসদের সঙ্গে গোল-যোগের গাঢ়তা লক্ষ্য করে ওরা তলে তলে যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। এ খবর গোপন ছিল অনেকদিন। তারপর একটু একটু করে সকলের মুখে মুখে এর প্রকাশ হয়। এর কিছুদিন বাদেই দেখা গেল—গ্রামে দুটি দল। পুরোহিত, ধোপা, নাপিতও পৃথক হলো।

এই দুটি দলের উদ্ভব হলো একটা ঘটনা থেকে। পুরোহিত, ধোপা, নাপিতও পৃথক হয় সেই থেকে। এখন সেই ঘটনাটিই বলি।

ব্রজেশ্বরদের বাড়ির লাগোয়া এক বৃদ্ধার বাস। তাঁর আপন বলতে কেউ ছিল না। হঠাৎ একদিন এই বৃদ্ধা রক্ত বমণ করে মারা যান। কয়েকজন যুবক মিলে তাঁর সৎকার করল। এদের মধ্যে ব্রজেশ্বরের ছেলে অনিল ও একজন।

বিশ্বাস ও দাসেরা এ সংবাদ রাখে। ইতিমধ্যে তারা একটা দল গড়ে তুলল। দলটি সর্বত্র প্রচার করল যে বৃদ্ধাটি ক্ষয় রোগে মারা গেছেন। যারা সৎকার করেছে তাদের প্রত্যেককে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ বিধি নাকি তাঁরা এনেছে ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছ থেকে।

একথা তারা পুরোহিত ঠাকুরকেও বলল। তারা আরো বলল—তিনি যদি শবদাহকারীদের বাড়ীতে পুজো আচ্চা করেন তাহলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হবে।

নিরুপায় হয়ে পুরোহিত ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা বললেন যুবকদিগকে। যুবক সম্প্রদায় এ বিধান মানল না। সমস্যা ঘোরতর ও জটিল হল। এদিক ব্রাহ্মণ সমাজের কঠোর

শাসনে পুরোহিতকে বাধ্য হয়ে তাদের পৌরহিত্য ছেড়ে দিতে হয়। এই থেকেই হয় দু'টি দলের পত্তন। একটা বিশ্বাস ও দাসেদের দল, আর একটা মিত্রদের দল। দুটি দলের মধ্যে মিত্রদের দলেই লোক বেশি। ওরা বলল—এর কোন যুক্তিতর্ক নেই।

গ্রামে দেড়শো ঘর কায়স্থের বাস। বিশ্বাস দাসেদের দিকে হলো পঞ্চাশ ঘর—আর বাকি সবই যোগ দিল মিত্রদের দিকে।

এটাকে, সত্য বলতে কি, মনেপ্রাণে যুক্তিতর্ক দ্বারা মেনে নিতে পারেন নি পুরোহিত ঠাকুর। সব সময়ই মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে।

দু'বছর কেটে যায়। চরের মামলা তখনও চলেছে। এর মধ্যে একদিন শোনা গেল—কয়েকদিন সমানভাবে রক্ত বমণ করে মারা গেছেন সেই পুরোহিত ঠাকুর। পুরোহিতের স্ত্রী সৌদামিনীর কাছে শোনা—পুরোহিত ঠাকুর নাকি মৃত্যুর পূর্বে রোজ রাত্রে ঐ বৃদ্ধাকে স্বপ্নে দেখতেন। বৃদ্ধা নাকি তাঁকে শুধু অভিশাপ দিতেন!

এর পর আরো দীর্ঘদিন মামলা চলে। এবারেও মিত্রদের জয় হয়।

নীল চাষ উঠে গেছে কবে। ব্রাডেন সাহেবও কবে দেশে ফিরে গেছে। হয়ত এতদিন তারও অস্বিত্ব নেই। তার কুঠিও নদীগর্ভে। তবু তার স্মৃতির বিলয় হলো না।

মাটির ক্ষয় না হলে কি স্মৃতির লয় হয়?

পোষ্টমাষ্টার

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন নিবারণবাবু। দিনরাত সেই স্লিসিভারের খট্ খট্ আওয়াজ বিকট ভাবে বুকে বাজতো। যেন বুকের ওপর দিয়ে ঘোড়-দৌড় হচ্ছে। ঘোড়ার খুরের ঠুকঠুকানিতে বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো মাঝে মাঝে। মনে হতো এ রকম বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

ভালোই ছিলেন পেনসন নিয়ে। সকালে বিকালে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হাওয়া খেতেন আর বাকী সময়টুকু কাটাতেন বই পড়ে, নিজেব ছেলে দু'টোকে পড়িয়ে—আর গল্প গুজব করে।

অভাব অভিযোগ তেমন কিছু ছিল না। যশোর জেলায় একটা গ্রামে বাড়ি। কিছু জমিজাতি ছিল তার। তা থেকেই বছবেব খোবাকটা হয়ে যেত। কাপড় জামা কেনাকাটি আর ছেলেদেব লেখাপড়ার খরচ যে পেনসন পেতেন তাতেই দুঃখে-কষ্টে হয়ে যেত। তাবপব সংসাবটাও তো তেমন কিছু বড় নয়। স্ত্রী আর দুটি ছেলে। মেয়ে একটি। তাব বিয়ে তো পেনসন নেবার আগেই হয়ে গিয়েছিল। দুটি ছেলেই স্কুলে পড়ে। ম্যাট্রিক পর্যন্ত তো গ্রামের স্কুলেই পড়ছে তাবা।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকাটা পেয়েছেন তার এক রকম সকলটাই মজুত ছিল তখন। ভেবেছিলেন ছেলে দু'টো

যখন আই. এ, বি. এ, পড়বে তখন সেই টাকাটা ওদের পড়াশুনা বাবদ ব্যয় করবেন।

হঠাৎ সারা আকাশ মেঘে মেঘে ঢেকে যায় গোলা বারুদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। আতঙ্কে কেঁপে ওঠে সমস্ত বিশ্ব। লড়াই বাঁধল জার্মান-ব্রিটিশে। তখনও নিবারণবাবু বুঝতে পারেন নি সেই গোলা বারুদের ধোঁয়া তার সারা দেহে লেপটে যাবে, বাদল নামবে চোখে আর ঝড় বইবে মনে।

কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের সব কিছু উধাও হয়। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। চারিদিকে কেবল হাহাকার।

মাল মজুত হলো মহাজনের ঘরে। চলতে লাগল রাতে কারবার। চার পয়সার জিনিস এক টাকা। দাম বিচার করবার ফুরসৎ কোথায় তখন? চাই মাল। খেয়ে বাঁচলে তো টাকা!

এক নয় তুই নয় দীর্ঘ পাঁচ বছর চলে এই লড়াই। নিবারণ বাবুর যা কিছু সঞ্চয় সবই ফুরিয়ে গেল রাতের কারবারে। এখন রইল কেবল মাত্র খড়ের ঘর তিনখানি আর কয় বিঘে জমি।

এর মধ্যে বড় ছেলে অনিল ম্যাট্রিক পাশ করেছে। পড়াশুনায় মন্দ নয়। আই, এ পড়তে চায়। কোনই উপায় ছিল না তার। তবু শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে স্ত্রীর গহনাটুকু বিক্রী করে কলেজের মাহিনা আর অন্যান্য ফি দেয়া এবং বই কেনা হয়। এতেও তার পক্ষে অনিলকে পড়ানো সম্ভবপর হতো না কিন্তু অনিল নিজেই তার খাওয়া থাকার সংস্থান করে নেয় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছেলে পড়িয়ে। তার পড়াশুনার খরচের না হয় একটা ব্যবস্থা

হলো কিন্তু সংসার চলে কি করে নিবারণবাবুর ? আর এ ছাড়াও তো অনিলের কলেজের মাইনে, বই খাতা কাগজ পেন্সিল চাই !

এর মধ্যে যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু জিনিসপত্তরের দাম কমলো কই ? তবু নিবারণবাবু মনকে প্রবোধ দেন—এই তো দুটি বছর যমে মানুষে লড়াই করে বেঁচে আছি পেট মোটা, শুকনো হাত পা দেহ নিয়ে। আর তো দুটি বছর ? এই ভাবেই যদি কাটিয়ে দিতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই ছেলেটা মানুষ হয়ে বেরুবে ইউনিভারসিটির একটা ছাপ নিয়ে। তখন আর ভাল চাকরির অভাব হবে না তার।

এরপর বছর পার না হতেই সুরু হলো কালবৈশাখী। ঝড়ো হাওয়া কতকগুলো আবর্জনা নিয়ে এসে ঢুকলো নিবারণবাবুর ঘরে। ঘরটা অন্ধকার হলো। চোখে দেখলেন ঝাপসা। ঘরের চালের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। শূন্যে শূন্যে বিক্ষিপ্ত উড়তে লাগল চালের খড়গুলো।

দু'ভাগে ভাগ হলো ভারত। আগুনের ফুলকি উড়ছে। জায়গায় জায়গায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে। নিবারণবাবুর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে অন্তর নিঙড়িয়ে।

তারপর একদিন ঘনবাদলের নিবিড় অন্ধকার রাত্রে ফেলে এলেন নিবারণবাবু তার শেষ সম্বল তিনখানি খড়ো ঘর আর কয় বিঘে জমি।

পেটের ক্ষুধা যে সব চেয়ে বড় আজ নিবারণবাবু তা টের পেলেন। পেন্‌সনের ক'টিই বা টাকা? তাতে কেবল বাড়িভাড়ার টাকাটারই ব্যবস্থা হয়। বাধ্য হয়ে তিনটে ছেলে পড়ানোর ভার নিলেন। এতে পঞ্চাশ

পান। এখন দুটিতে মিলিয়ে কোনমতে একবেলার উদর পুরতি হয়।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন পুরনো ঘা'টা থুকথুকিয়ে ওঠে।

অনিল বলল—বাবা, আপনাকে একখানা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে মুখুজ্যে সাহেবকে?

নিবারণবাবু চমকে ওঠেন মুখুজ্যে সাহেবের নাম শুনে। বললেন—কে, কোন মুখুজ্যে সাহেবের কথা বলছিস তুই?

—কেন, মুখুজ্যে সাহেব তো আপনারই ইন্সপেক্টর ছিলেন।

গা'টা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল নিবারণবাবুর। মুহূর্তে মনের গহনে ফেনিয়ে ওঠে অতীতের ছোট বড় অনেক কাহিনী।

হ্যাঁ, এই মুখার্জী সাহেব—সুদর্শন মুখার্জী। ইনি ছিলেন ইন্স্পেকটর। আমি ছিলাম দুর্গাপুরের পোষ্টমাষ্টার। মুখার্জী লোকটা ভালো। তাঁর কলমে কোনদিনও একটা খারাপ রিপোর্ট ওঠেনি আমার সম্বন্ধে। পেনসন নিতে তিনি বারবার বারণ করেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, আরো দু'চারটে বছর যখন ইচ্ছা করলেই কাজে বহাল থাকতে পারেন তখন রিটায়ার করবেন কেন? দু'টি ছেলেই তো ছোট? রিটায়ার করলে কি করে তাদের পড়াশুনার খরচ চালাবেন ভাল করে ভেবে দেখবেন অনেক বার।

এর জবাবে নিবারণবাবুর দু'একটা কথা বলবার ছিল কিন্তু বলতে পারেন নি। বারো বছর আগে মনে যে ক্ষত হয়েছে তা থুকথুকিয়ে উঠে—তার পোকাগুলো কণ্ঠনালীতে এসে বাক্‌রোধ করে দিল। সুদর্শন মুখার্জী এ খবর জানতেন

না। নিবারণবাবু ছিলেন রামপুরে সাব-পোষ্টমাষ্টার। আর তাঁর ইনস্পেক্টর ছিলেন সতীশ সরকার। মুখার্জী সাহেব তখনও চাকরীতে ঢোকেন নি।

অনিল বলল—দরখাস্তটা য়্যাডরেস্ করবেন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল থ্রু মিঃ সুদর্শন মুখার্জী সুপারিনটেনডেন্ট অফ পোষ্ট অফিসেস্, জলপাইগুড়ি। আপনি জানেন বোধ হয় মুখার্জী আজ এক বছর হলো সুপারিনটেণ্ডেন্ট হয়েছেন। তাঁর 'জোনে'ই নাকি লোক নেবেন কয়েকজন।

নিবারণবাবু অবাক বিস্ময় বিহ্বল চোখে অনিলের পানে চেয়ে বললেন—চাকরি করবি তুই আর দরখাস্ত দেব আমি, এর মানে?

দরখাস্তটা লিখবেন আমার হয়ে, আমার জন্য আপনার দুঃখ দৈন্য জানিয়ে, বলল অনিল। আর যা করতে হয় তা তিনি ক'রবেন। তাহলে দরখাস্তটা অতি অবশ্য লিখে রাখবেন রাত্রে। আমি কালকার ডাকে পাঠিয়ে দেব তাঁর কাছে।

অনিল চলে গেছে।

এবারে আরো চিন্তা ঘনিয়ে এলো। তারপর—তারপর? হ্যাঁ, রামপুরে থাকাকালীন একদিন চিঠিগুলোতে শীল মারছিল পোষ্টম্যান। আমার নামে লেখা চিঠি দেখতে পেয়ে সেটা এগিয়ে দেয় আমার কাছে। খুলে পড়লাম চিঠিটা। মা লিখেছেন ঃ—'তোমার বাবার খুব অসুখ, যত সত্বর পার বাড়িতে চলিয়া আসিবে'।

ঐদিনই 'তার' করলাম সুপারিনটেণ্ডেন্টকে রিলিফের জন্যে। সন্ধ্যায় রিসিভারের কাছে একটা চেয়ারে বসেছিলাম তারের জবাবের প্রতীক্ষায়। স্ত্রী সুমিতা ছিল দরজা

ঠেস্ দিয়ে মেঝেয় বসে। হঠাৎ একটা তার এলো। তার খট্ খট্ আওয়াজে মনটা নেচে ওঠে। সুমিতাও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মুহূর্তে সারা মনটা বিষণ্ণতায় ভরে গেল। তারের খট্ খট্ শব্দ তখনও মনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সুপারিন-টেণ্ডেন্টের তার নয়। তার করেছেন মা। তারের মর্মার্থ এই 'তোমার বাবার জীবনের আশা নাই। যদি চোখের শেষ দেখা দেখতে চাও তাহলে অতি সত্বর চলে আসবে।'

পরদিন সকাল আটটা নাগাদও তারের জবাব এলো না। আবার তার করলাম নয়টায়। জবাব এলো সন্ধ্যায়, রিলিফ পাঠাচ্ছি।

বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন নিবারণবাবু। রিলিফ এলেই চার্জশিটটা দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও রিলিফ এলো না। রিলিফ এল তার পরদিন।

চার্জ দিয়ে বাড়ি রওনা হলেন তিনি। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। চোখে ঝাপসা দেখেন নিবারণ বাবু। তারপর যা দেখতে পেলেন তাতে মাথা ঘুরে গেল তাঁর। বাড়ির অঙ্গন ভরতি স্ত্রী.পুরুষ, ছেলে বুড়ো। কাতর কণ্ঠের রোল আসছে ভেসে।

এ-তো গেল শীতের কন্‌কনানি। তারপর বসন্ত এলো, ফুল ফোটে ফোটে তবু আর ফুটল না। বসন্তের অবসান না হতেই রুদ্র ভৈরবের তাথৈ তাথৈ নৃত্য সুরু হলো। হঠাৎ ছোট ছেলেটির হলো জ্বর। একদিন, দুইদিন তারপর দেখতে দেখতে এক হপ্তা কেটে গেল তবু তার জ্বর রেমিশন হলো না। বরং অন্যান্য উপসর্গ ফাঁপিয়ে উঠেছে। আশপাশের সাতটি গাঁয়ের মধ্যে তখন রামপুরেই শুধু একজন পাশ করা

ডাক্তার। তাঁর অসুখ, তিনি ভুল বকছেন জ্বরের ঘোরে। এখন শুধু তিনজন হাতুড়ের ওপরেই রামপুর ও আশপাশের সাত সাতটি গ্রামের জীবনের ভার।

ছুটীর জন্য 'তার' করলেন নিবারণবাবু। ইচ্ছে টাউন হাসপাতালে নিয়ে যাবেন ছেলেটাকে। কিন্তু যথা পূর্বং তথা পরং। ঠিক সময়মত কোন রিলিফ এলো না। এর পর দু'দিন পরে হঠাৎ দুপুরে কেঁদে ওঠে বাড়ির সবাই। নিবারণবাবুর ফুরসৎ ছিল না সেদিকে মনোযোগ দেবার। তিনি ব্যস্ত ছিলেন 'তার' রিসিভ করতে। টরে টক্কা টরে টক্কা টরে টরে টরে টক্!

ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছেন সুমিতা। বললেন—বসে বসে কী ভাবছ, রাত তো অনেক হলো। দরখাস্তটা লিখে ফেল না তাড়াতাড়ি। এসব কাজে দেরি করলে চলে না।

হাঁ, না, কোন জবাব না দিয়ে কাগজ, কালি, কলম নিয়ে বসেন নিবারণবাবু। মাথা ঘুলিয়ে যায়, হাত সরে না। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। খট্ খট্, টরে টক্কা টরে টক্কা টরে টরে টরে টর্।

সুমিতা কি বুঝলেন জানেন না নিবারণবাবু।

এর এক ফাঁকে এলেন অনিল।

অনিলকে দেখতে পেয়ে সুমিতা বললেন—দরখাস্তটা তুই লিখে নে না খোকা, উনি একটা সই দিলেই হবে?

সুমিতার কথায় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন নিবারণবাবু। বললেন—তাই কর বাবা! আমি ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারছি নে!

খট্ খট্ খট্। টরে টক্কা টরে টক্কা টরে টরে টর্! কাৎ হয়ে শুয়ে পড়েন নিবারণবাবু।

তৃষ্ণা

এ যেন ঠিক সরিকানা স্বত্ব নিয়ে গোলমাল। পান থেকে চুন খসবার জো নেই। বন্দনা ভাবতে পারে না। বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটে তার।

বাড়ীতে কেউ নেই। সে একা। বাবা গিয়েছেন তার কাজে। ভাই সুনীল কলেজে। মা ও বোন চন্দনা গিয়েছে মামীর বাড়ী বেড়াতে তেমন কিছু বেলা হয় নি। এই মাত্তর গির্জেয় বারোটার ঘন্টা বাজলো। পাঁচ ছটার আগে কেউ ফিরবে না। ভাবলে—এঁটো বাসন পত্তর না হয় পরে ধোয়া পোঁছা করবে। অনেক সময় আছে। সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল পা ছড়িয়ে, ভেতর বারান্দায় দেওয়াল ঠেস দিয়ে। হাতে একখানা নভেল। কাল রাতে খানিকটা পড়েছে। বইখানা বেশ ভাল লেগেছে। রাতেই শেষ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি মার জন্যে। দশটা বাজতে না বাজতেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, বাতি নিভিয়ে দে বন্দনা! গত মাসে বড্ড বেশি উঠেছে মিটারে। দিন দিন ইলেকট্রিক ট্যাক্স বেড়েই চলেছে।

কেউ নেই এই সুযোগে বইটা এক্ষুণি পড়ে শেষ করতে হবে, বেশ নিরিবিলি। অল্পক্ষণ পড়লেই শেষ হয়ে যাবে। বই পড়ছে, কয়েক পাতা পড়েই থেমে গেল সে! উঃ কী অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ছোট বোনের।

কেশব বাবুর দুই মেয়ে। ছেলে নাই। স্থাবর সম্পত্তি

সমান সমান ভাগ হয়েছে। অস্থাবর সম্পত্তি নিয়েই বাধলো যত গোলমাল। জিনিস একটি অথচ তা দু'বোনেরই চাই। বড় মেয়ের অবস্থা ভাল। যথেষ্ট জায়গা জমি আছে। তার উপরে জামাইও বেশ মোটা মাইনের চাকুরে। ছোট মেয়ের অবস্থা ভাল না। জামাই প্রাইভেট কলেজে প্রফেসরি করে। কোনমতে সংসার চলে। মা বেঁচে থাকতে অনেক কিছুই পাঠিয়ে দিতেন অভাবী বলে। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

ছোট বোন বলল, দিদি তোমার তো অনেক বাসন পত্তর, আসবাব পত্র আছে। জানোই তো আমার কিছুই নেই। ঐ কয়েকটা জিনিস আমাকে দাওনা।

না, তা আমি দিতে পারিনে। তুমি চুপেসাড়ে অনেক কিছু নিয়েছ মা থাকতে। আর না। বড় বোনের স্বর ভার। আমারও তো ভগবানের কৃপায় তিনটি ছেলে আছে। সবগুলো তাদের লাগবে।

একটুক্ষণ নীরব থাকল ছোট বোন। তারপর বললে— আচ্ছা, লোক জানাজানির কি দরকার আছে দিদি। তোমার যা দরকার, তুমি বেছে নাও।

আর চন্দনা। একেবারে উলটো। একটু চুলও ছাড়বে না বরং যে-টুকু আমার নিজের পাওয়ার আশা আছে সে-টুকুও সে কেড়ে নিতে চায়। কী আশ্চর্য এই মেয়ে চন্দনা আর কী অদ্ভুত তার ক্ষুধা। সে যেন সব সময়ই ওৎ পেতে থাকে বাজপাখির মত। মা কি কম বকেন তাকে। তবু তার যদি আক্কেল হয়। কত দিন তো তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেছেন তিনি তবু হাতছানি দিয়ে পর্দা ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে।

চন্দনা ষোড়শী। যৌবনে স্ফীত তার দেহ। লোকে বলে সে রূপসী। আমার চেহারা কি খারাপ? একটু হাসলে কি কথা বললে কি বিশ্রী দেখায় তাকে। খ্যাঁদা নাক। কান দুটিও মানান সই নয়। বড্ড ছোট। আমার চোখ মুখ নাক কানের প্রশংসা কে না করে?

অনেক সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে দেখি। না হয় আমার রংটা একটু কালো। চন্দনার রংটাই যা ফরসা। আমার চোখ-মুখ-নাক-কানের কাছে কি সে দাঁড়াতে পারে। তার চোখ তো ছোট কুৎকুতে। সামনের উপর পাটির দাঁত কোদালে। একটু হাসলে কি কথা বললে কি বিশ্রী দেখায় তাকে। খ্যাঁদা নাক। কান দু'টিও মানানসই নয়। বড্ড ছোট। আমার চোখ-মুখ-নাক-কানের প্রশংসা কে না করে? খুশিতে ভরে ওঠে মন, মনে মনে বিচার করি চন্দনার সঙ্গে। মুহূর্তে চোখের ওপর ভেসে ওঠে সে। মনটা তিতিয়ে ওঠে। মুখটা ম্লান হ'য়ে পড়ে। কটু তিক্ত ফেনা ওঠে মুখে। শুধু ফরসা হ'লেই কি সব দোষ ঢেকে যায়? লোকের কি চোখ নেই? তাদের কি বিচার করবার ক্ষমতা একটুও নেই?

চন্দনা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। আমার একুশ। তার ষোল। তাকে ভালোই লাগত আমার। খুবই ভালবাসতাম। প্রাণের চেয়েও বেশি, আর ভালবাসব না কেন? সে তো নিজেরই বোন। তার উপর তাকে তো আমি মানুষ করেছি কোলেপিঠে করে। একটা নয় দুটো চারটে বছর। তার বয়স তখন চার। মা পড়লেন অসুখে। সুতিকা রোগ।

পুরো চারটি বছর থাকলেন বিছানায়। ঘরে দ্বিতীয় লোক নেই যে আমাদেরকে দেখে। ওকে রাখতাম আমি। আমারই পিছনে পিছনে সব সময় ঘুরঘুর করে চলত, আমারই কোলে চড়বার জন্য আবদার ধরত। আমি ছাড়া কারো হাতে খেতনা, কারো কাছে থাকত না। কত ছড়া বানিয়ে বলতে হত আমাকে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। সে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকত। শেষে ঘুমিয়ে পড়ত আমার বুকে। বুকখানা ভরে উঠত স্নেহমমতায়। চেয়ে থাকতাম তার ঘুমন্ত মুখের দিকে। কী সুন্দর মুখখানা, কী সরল, সহজ ও সরসতার ভাব।

জগৎ পরিবর্তনশীল। তবু কি সব ধুয়েমুছে যায়? একটু চিহ্নও কি থাকে না? এ-সব ভাবতে চন্দনার গায়ে জ্বর আসে। এখনো তো মাঝে মাঝে চন্দনার কোমল ত্বক তার হাতে সুড়সুড়ি দেয়। চন্দনার কি হাতের স্পর্শ একটুও লাগেনি মনে? সে যেন আজ কাল কেমন হয়ে গেছে। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। শিশির গ্যাস ভরা জল যেন ঠেলে দেয় কর্কটা।

সেদিন বাবা বলছিলেন মাকে—কি করবো বলো? কত চেষ্টাই তো করছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'চ্ছেনা। চোখের উপর সব তো দেখতেই পাচ্ছ। লোকও তো কম এলোনা। কি জানি এক বিয়ের খরচ এরই মধ্যে হয়ে গেছে। তোমার ছোট মেয়েই তো গোল পাকিয়ে দেয়।

মা বললেন—ও পোড়ারমুখিকে নিয়ে যে কি করব আমি? কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না ওকে। সেদিন

হাত টেনে ধরেছিলাম। এক ঝাঁকি দিয়ে ছুটে গেল। ওর সঙ্গে কি আমি পারি? ওর উঠন্ত বয়স। গায়ের জোর ও মনের বল দুই-ই আছে। একটা কেলেঙ্কারি না করে বসে শেষ পর্যন্ত সেই-ই ভয়।

আমারও তো সেই ভয় হয়, বললেন বাবা। বন্দনা তো শান্ত। ওর জন্য ভাবনা নেই। তুমি বরং চন্দনাকে পার কর আগে, বললেন মা। আর আজকাল তো এমন অনেক খানেই ঘটছে। এতে কেউ নিন্দা বা অপবাদ দেবেনা।

সব কথাই শুনেছিল আড়াল থেকে চন্দনা। উঃ কি খুশি হয়েছিল সেদিন সে।

বন্দনা তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সেও মা বাবার কথা শুনছে। পাফ্ দিয়ে পাউডার ঘষছে মুখে। একটা ঝড়ো হাওয়ার দোল দিয়ে পরীর মত উড়ে এল চন্দনা। হেসে কুটিপাটি। বললে—মরা চামড়ায় কি ঘষছিস দিদি? ঘা হ'য়ে যাবে যে ঘষতে ঘষতে! মা কি বলছিলেন শুনেছিস্ তুই?

বড় রাগ হল বন্দনার। ইয়ারকি মারার আর জায়গা পাওনি—এই বলেই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ভারি নির্লজ্জ এই চন্দনা। সেদিন মার মুখের উপর যা সে বললে তাকি কোন বিয়ের বয়সী মেয়ে মাকে বলতে পারে? বিয়ের বয়সী মেয়ের লজ্জা হয়ই। সে বললে—তোমরা তো তাতেই আমাকে দোষ দাও—এটা বোঝনা যে পানসে খাজা কাঁঠাল কোন ভদ্রলোকে খায়না। মা রেগে উঠে বললেন—বেহায়া মেয়ে কোথাকার! একটু যদি মুখের জড়তা থাকে। পোড়াকপালি, সে দিন তুইই তো সব পণ্ড

করলি। বিয়ে তো এক রকম ঠিকই হ'য়ে গিয়েছিল, রাম-বাবু দেখে শুনে পছন্দ করে গেলেন। পরদিন ছেলে এল দেখতে। দাঁড়ালি তার সামনে গিয়ে একেবারে গা ঘেঁষে। তোকে দেখেই তো ছেলেটা বিগড়ে গেল। তার দু'দিন পরই রামবাবু লিখলেন—আপনার বড় মেয়ের বিয়ে অন্যত্র ঠিক করুন। আমার ছেলে আপনার ছোট মেয়েকে—বলেই থেমে পড়লেন মা।

চন্দনা বললে—রামবাবু বুড়ো মানুষ। তাঁর কি কোনো পছন্দ আছে—না চোখ আছে? চশমার ফাঁক দিয়ে কতটুকুই বা দেখতে পান তিনি। তারপর বুড়োদের লোভ একটু বেশি। ভাল করে খাইয়েই তো তাঁকে বশ করেছিলে। ছেলের ত আর চোখে চশমা নেই। নতুন চোখ তার। খুটি-নাটি সবই তাঁর চোখে পড়ে। তারপর সে মুখের স্বাদ চায় না—ভাল ভাল খাবার খেয়ে। সে চায় দেহের স্বাদ রূপ-রস গন্ধে ও স্পর্শে।

—লক্ষ্মীছাড়ি, একটা বড় রকম কেলেঙ্কারী না করে ছাড়বিনে তুই দেখছি। এতো লোক মরছে কলেরায়, তোর মরণ নেই। যমরাজ বুঝি অন্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ বন্দনার কানে এল গীর্জার ঘণ্টার শব্দ। কয়টা বাড়ি পড়ল ঠিক করতে পারলে না সে। তিন চারটে হবে। তড়বড়িয়ে উঠে গেল ঘরে। টাইমপিসটায় চারটে বেজেছে। আর তো দেরী করা চলে না। ওরা তো এক্ষুনি এসে পড়বেন বাসনের বোঝা নিয়ে কলতলায় মাজতে বসল।

দুই মাস পরের কথা। চন্দনার কচি লাউয়ের ডগার

মত চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। বন্দনার বড় মনে লাগে। হাজার হলেও নিজের বোন তো। সে ভাবল তার জন্যই তো চন্দনা ভেঙ্গে পড়ছে, নিজে মরতে বসেছে—মরবে। ওকে কেন মারবে? ওর পথে কেন কাঁটা বিছিয়ে রাখবে সে? কেনই বা সে জীবন ভরে অভিশাপ কুড়িয়ে চলবে।

বন্দনা একটু আধটু গান বাজনা জানত। একদিন মাকে বললে, গানের স্কুলে গান শিখবে সে।

মেয়েকে একটা কিছুতে নিযুক্ত রাখা ভালোই। কু-চিন্তা মনে আসবে না। মা বাবা উভয়েই সম্মতি দিলেন।

গান শেখে চন্দনা। বিচিত্র সুরের ঢেউ খেলে তার মনে। তালে তালে আনন্দে নেচে ওঠে সারা হৃদয়-তন্ত্রী। মধুক্ষরা শূন্য কোষগুলি আবার ভরে উঠেছে। কোকিল ডাকছে বনে। বসন্তের হাওয়া লেগে ফুটে ওঠে ফুল। তার কোষে কোষে মধু। বন্দনা সুর ভাজে সকল সময়। হাতে কাজ, মুখে সুর। তার প্রবল উৎসাহ, অপরিমেয় বল দিল মা-বাপের মনে। মা, বাবাকে বললেন—বন্দনা বলছিল—সে আর বিয়ে থা করবে না। তোমরা চন্দনাকে বিয়ে দাও, আর সত্যি সে তো যা হোক একটা রস পেয়েছে। তা' নিয়ে এখন বেশ দিনগুলি কাটাতে পারবে। ওর জন্য আর ভাবনা নেই তুমি বরং চন্দনার বিয়ে ঠিক করে ফেল।

শেষ পর্যন্ত চন্দনার বিয়ে হয়ে গেল রামবাবুর ছেলে নগেনের সঙ্গে। বন্দনার বড় লজ্জা করে নগেনকে দেখলে। ভয়ও হয়। চোখ দুটি লাল জবার মত। থাকে যেন লোলুপ

শিকারী বাঘের মত। একদিন একটু আড়চোখে এক পলক দেখেছে সে নগেনকে, কিন্তু সেদিন এমনটি দেখেনি।

অল্পকালের মধ্যেই গান বাজনায় বেশ নাম করেছে বন্দনা। প্রায়ই রেডিওতে গান গায়। এ সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে হিরণ। এই হিরণের সঙ্গে তার আলাপ হয় প্রথম দিনেই যেদিন সে স্কুলে যায়। ঠিক আলাপ বলা চলে না। তবু আলাপ বৈকি? মনে মনে দু' জনেরই জানা-চেনা, শুধু জিভের জড়তা কথা বলি বলি করেও বলতে দেয়নি। হিরণকে বড় ভাল লাগত বন্দনার। কী মিষ্টি চেহারা। ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে তার। হিরণেরই তো কথা বলার প্রথম পালা। সে না বললে বন্দনা বলে কি করে? সে যে মেয়ে। লোকে কি বলবে দেখলে?

শেষ পর্যন্ত হিরণেরই জড়তা কেটে গেল। এটা হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। সে বললে, ভাল করে গান শেখ বন্দনা। আমি তোমাকে রেডিওতে ঢুকিয়ে দেব। এই থেকে সুরু হয় তাদের আলাপ পরিচয়।

হিরণ বড় সঙ্গীতপ্রিয়। নিজেও বেশ গাইতে পারে। বন্দনাদের স্কুলের সেই-ই কর্তা। তারই টাকায় এই স্কুলটি তৈরী। বাপের বড় লোহার ব্যবসা আছে। বি, এ, পাশ করে তাই তদারক করে। চাকরি বাকরি কিছু করে না।

বন্দনাকে বড় ভাল লাগে তার। স্কুলের শেষে সে রোজ তাকে উজার করে ঢেলে দেয় তার জানা অজানা সব সুর।

একদিন রেডিও স্টেশন থেকে গান গেয়ে ফিরছে বন্দনা। সঙ্গে হিরণ। বন্দনা বললে-আর তো চাপা রাখা যাবে না। মাকে বলে বাঁশি বাজিয়ে দাও।

একটু দুষ্টু হাসি হেসে হিরণ বললে—এত তাড়াহুড়োর কি আছে ?

বন্দনা কাতর গলায় বললে—ছিপে খেলতে খেলতে যে মাছের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর কত খেলবে বল ?

হিরণ বন্দনার বাঁ হাতটি ধরে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বললে—ভয়কি ? আজই ঘরে গিয়ে শুনতে পাবে বাঁশি বাজার শব্দ। দু'জনারই চোখেমুখে ফুটে উঠলো এক ঝলক কচি প্রাণমাতান হাসি।

এক বছর পরের কথা এর মধ্যে বন্দনার একটি ছেলে হয়েছে। সেদিন বিকেলবেলা বারান্দায় বসে ছেলের জন্য মোজা বুনছিল। হিরণ সেইখানেই গুন্ গুন্ করে গান গাইছিল ছেলে কোলে নিয়ে। হঠাৎ তাদের মধ্যে এসে হাজির হল চন্দনা।

ছেলেটি বড় বায়না ধরেছে। হিরণকে চলে যেতে হ'ল সেখান থেকে ছাদে খোলা জায়গায়। চন্দনা বললে—দিদি, তোর কাছে কিছুদিন থাকব। একটু জিরিয়ে যাই। আমার হাড়মাস সব খেয়ে নিলে সে। কী মাতালের হাতেই না পড়েছি।

বন্দনার বড় ভয় হলো মনে। আগের কথা মনে পড়তেই তার মুখ চোখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে কথা কইতে পারলে না। তারপর দরদ হলো বোনের ওপর, ভাবলে তাইতো চন্দনা তো তার উপকারই করেছে। একটা স্বস্তি নিশ্বাস ছাড়ল বন্দনা।

দিদিকে নীরব দেখে চন্দনা বললে—ভয় নেই দিদি। সব তৃষ্ণা মিটে গেছে আমার।

জাগরণ

ছোট ঘর। ছাউনি ও দেওয়াল খড়ের। পোতা মেটে। ছয় ইঞ্চি উঁচু হবে জমিন থেকে। ঘরের একপাশে ছোট একটা দরজা। তাও বাঁশ খড় দিয়ে তৈরি। মাথা নিচু করে ঘর-বার করতে হয়। জানালার বালাই নেই। দিনের বেলাতেই ঘোর-অমানিশা ঘরের ভেতর উত্তর দিকে একটা ছোট চালা বার করে ঘিরে নিয়েছে তারা। এর একপাশে থাকে গাই-বাছুর। আর অপর পাশে থাকে দুটি ছাগল। তারপর ছোট্ট উঠানের এক কোণে আর একটি ছোট ঘর। ঘর বৈ কি! তারও ছাউনি আছে, আছে দেওয়াল? এ ঘরটি মাটি থেকে তিন ফুট উঁচু, সাড়ে তিন ফুট চওড়া আর চার ফুট লম্বা। ছাউনি লতাপাতার, দেওয়াল গাছের ডালপালার। এতে থাকে ছোট বড় গোটা চারেক শুয়োর। এ ছাড়া মুরগিও আছে কতগুলো। তারা ঘরের এক পাশে চুপটি করে থাকে রাতে। মোটের ওপর সাত পাঁচ নিয়ে সংসারটি একেবারে ছোট নয়। দুটি লোক হিমসিম খায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেক আগে। মেঘ ভরতি আকাশ। একটা থমথমে ভাব। খুলে দরজার গোড়ায় বসে। কোলে আট মাসের ছেলে। কিছুতেই ঘুম পাড়াতে পারছে না তাকে। ছোট মেয়েটির বয়স তিন বছর। কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝেতে।

আর বড়ো মেয়ে—বয়স ছ' বছর, বসে আছে তার বাঁ দিকে। চোখ ভরা জল। মুখে সাড়া-শব্দ নেই। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। সামনে টিমটিম করে জ্বলছে একটা সরু সলতের প্রদীপ। কিছুই দেখা যায় না তাতে। মুখ বুজে অপলক চেয়ে আছে থুলে অলিন্দের দিকে। যতদূর চোখ যায় ক্ষীণ প্রদীপের শিখা ধরে আঁধার ভেদ করে। তন্ময় হয়ে ভাবছে সে। খেয়াল নেই। গরু শুয়োরের ঘরে এক হাঁটু কাদা; মশার কামড়ে লেজ নাড়ছে, পা ঝাঁড়ি দিচ্ছে তারা। চমকে উঠছে থুলে। সলতেটা একটু বাড়িয়ে দেয়। পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার ডুবে পড়ে ভাবনায়। বাড়িময় কাদা। গরু শুয়োরের যাতায়াত ও ধস্তাধস্তিই এর জন্যে পনের আনা দায়ী। মেয়ে দুটি দিনের বেলা ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় উঠানের ওপর দিয়ে। পাযেব আঙ্গুলের ভেতর ঘা হয়েছে তাদেব। আজ কাজ কর্ম ছিল না, মনে কবেছিল বিকেলে গুদাম থেকে কিছু পোড়া কয়লার খবাণি এনে বিছিয়ে দেবে।

হঠাৎ একটা পচ পচ আওয়াজ শুনতে পেল। বাতির সলতে আরো একটু বাড়িযে দিল। ও কে আসছে? একটা লোক না! মনটা নেচে উঠল আনন্দে। একটুক্ষণ বাদেই মোহ কেটে গেল। ভ্রূ কুঁচকে নিজেব মনে বললে—না, এ যে ব্যাটা ছেলে! হাঁ, তাই তো। ঐ তো প্যান্ট পবা।

আইধোজ এসেছে। মুখখানা ভার ভার। কিছু না বলে বসে পড়ল বাতিটাব একেবারে সামনে।

থুলে বললে—আঙিনা হেরনু সেগদাই না। বাতির সামনে থেকে সরে বোস্ আইধোজ।

কোলের ছেলেটি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বড় মেয়েটিও এর ভেতর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। খেয়াল নেই থুলের।

আইধোজ বললে—কাঙ্খা কোলকে নিদানচ্ছ। উছিকো শোতাইকে দিন্নু?

ছেলেটাকে পাশের মেঝের ওপর বড় মেয়েটার কাছে নামিয়ে রাখল থুলে। তার পর জিজ্ঞেস করলে—তেরো বুড়ি হাসপাতালমে কস্তো ছ?

—আচ্ছা হই না, বললে আইধোজ। থাকতে চাইলাম সেখানে কিন্তু থাকতে দিলে না ডাক্তার কম্পাউণ্ডারে। খুব রক্ত ভাঙছে। মনটা বড় অস্থির। মা খেতে দিল। খেতে পারলাম না। ভুক্তভোগী না হলে তো ব্যথা বুঝবে না কেউ তাই তোমার কাছে এলাম।

বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল থুলে। টেনে টেনে বললে—হাঁ, বিষেই বিষ ওঠায়।

দুজনেই কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর আবার থুলে বলতে সুরু করল—সেদিন থেমেই তো গিয়েছিল সব। কি কুক্ষণে ঐ বাবুটি এল শহর থেকে? তখনও মিটিমিটি আগুন জ্বলছিল খড়ে। তাতে ছিটিয়ে দিল বেশ খানিকটে কেরোসিন। আর যায় কে কোথায়? দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আবার। যেই একটু নেভার মত হয় অমনি ঢেলে দেয় আরো আরো অনেক তেল। রোজ রাতে হয় মিটিং। পুরুষের আর কিছু করতে হবে না। এখন থেকে মেয়েরাই সব করবে। হরতাল চালাবে তারা। পিকেট করবে তারা। ঝাড়ু হাতে তারাই এগিয়ে যাবে পুলিশের সামনে। দেখলে তো সে দিন? পুরুষেরা কাজে

বেরিয়েছিল, মেয়েরা যায় নি। আর কী বকুনিটাই দিল আমাদেরকে মেলাতে গিয়ে। আমরা নাকি কোন কাজের না, শুধু তাদেরকে চাটতে পারি। আরো কত কি! কানে আঙ্গুল দিয়ে ফিরে আসতে হলো ঘরে।

আইধোজ বললে—যাই বল, মেয়েদের জন্যই আমরা জয়ী হবো। আমরা তো কতদিন কত আন্দোলন করেছি কিন্তু তাতে কি সকলকে কাজ থেকে নিরস্ত করতে পেরেছি? না হলে এ রকম পূর্ণ হরতাল কখনো হতো না। এবারে নিশ্চয়ই আমাদের দাবী মিটাতে হবে মালিকদের।

—ঐ আশায় বসে থাক হাত পা তুগুমুণ্ডু করে, বললে থুলে। এই তো সুখের নমুনা! ছেলেমেয়ে ক'টিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালে সে। আর তোমার বউ হাসপাতালে মরতে বসেছে। পেটের ছেলের কথা তো ছেড়েই দিলুম।

স্ত্রীর প্রসঙ্গ ওঠাতে আইধোজ মুষড়ে পড়ে। তার মাথা ঘুরছে। বুক দপদপ করছে। সে আসন ছেড়ে উঠে বললে—রাত অনেক হয়েছে। এখন ঘুমোও গে। আজ ছাড়বে না ওকে।

একটা বুকফাটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে থুলে। নির্বাক বসে রইল ক্ষণকাল। পরে একটা কঙ্কট বানিয়ে দীপের শিখায় ধরিয়ে টানতে লাগল। দু' তিনটা টানেই কঙ্কটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। উঠে গিয়ে পাঁচ ছয় ইঞ্চি উঁচু একটা বাঁশের মাচান পেতে নিল ঘরের মেঝেয়। সেখানা দিনে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দেওয়া থাকে। ছেলেমেয়েগুলোকে শুইয়ে দিল তাতে। একপাশে নিজেও শুয়ে পড়ল মাথার নিচে হাত রেখে। বাচ্চা তিনটিকে আগেই কিন্তু খাইয়েছিল।

নিজে কিছুই খেল না। মোটেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই তার। বুকে পিঠে পেটে খিল ধরে আছে। তেমাথার বটগাছের বিষাক্ত বাতাসে সারাদেহে আগুণ জ্বলছে রি রি করে।

বড় গুমোট। ঘামে নেয়ে উঠেছে থুলে। চাঁচাড়ির তৈরী ভাঙ্গা পাখাখানা খুঁজে পেল না। অগত্যা গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল শুয়ে শুয়ে। ঘুম আসছে না। হাতের গামছা কখন অসাড়ে বুকের ওপর পড়ে গেছে টের পায় নি। সাগরের ঢেউয়ের মত অগুনতি চিন্তা আসছে মনে। দেহ নিস্পন্দ। এক মনে ভাবছে সে। পাতলিকে বললাম —ও সব হাঙ্গামার ভেতর গিয়ে কাজ নেই। উত্তরে বললে —সবাই যদি বলে যেও না—তাহলে যাবে কে? দু' এক জনকে তো এগিয়ে যেতেই হবে। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে? মনে পড়ল তার শ্বশুরের কথা। বড় তেজী লোক ছিল সে। এই চা বাগানেই চাপরাশীর কাজ করতো। আগের দিনেও সাহেবেরা ভয় খেত তাকে। কারো তোয়াক্কা করত না। মুখের ওপর টাটকা টাটকা কথা শুনিয়ে দিত। তাতে কি কম ক্ষতি হয়েছে তার। এই জন্যই তো বড় মুন্সী হতে পারল না কোনোদিন। তারই মেয়ে তো পাতলি। সে রক্তের তেজ যাবে কোথায়? তেজী বাপের জেদী মেয়ে।

আজ কাজ হবে না। পুরো হরতাল চলবে। মনে করছিলাম—ভালই হলো। দুই কুল বজায় থাকবে। হরতালেও যোগ দেওয়া হবে, আবার ধান ও ভানতে হবে ঢেকিতে। এবারে রেশনে ধান পেয়েছি। ধান ভানতে একদিন বসতেই হতো। ঘরে চাল বাড়ন্ত। বড় জোর টেনেটুনে কালকের দিনটা চলতে পারে। একা একা ধান

ভানিই বা কি করে? কেউ বা পার দেয় তার, কেউ বা আগলিয়ে দেয়? তারপর এই তিন তিনটে ছোট ছেলে-মেয়ে। ভাবতে প্রাণে জ্বর আসে। দোকান থেকে বদলিয়ে আনা যায় কিন্তু তাতে তো অনেক লোকসান। দশ সের ধানে দেবে সাড়ে পাঁচ সের চাল। অথচ নিজেরা ভানলে তাতে পাব সাত সের। আর স্তুধুই কি দেড়সের চাল কম পাব? কুড়োও তো পাব না। গাইটা বাচ্চা দিয়েছে এক মাস হলো। মাড়ের সঙ্গে কুড়ো মিশিয়ে দিলে দুধও বেশি হবে। এক মুঠো ঘাস আনতে পারলাম না। গরুটির পেট শুকিয়ে খোড়লে গেছে। কাল দুধ ভাল মত পাওয়া যাবে না। শুয়োর ও ছাগল দুটির জন্য কোন ভাবনা নেই। ছেড়ে দিলে এখানে সেখানে চরে খেয়ে আসবে ওরা। কিন্তু গরু ছাড়বার জো নেই। কারো বাড়িতে কি চায়ের বাগানে ঢুকলেই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেবে।

ঘরে বসে দেখলাম বিকেলে মেয়েরা বিরণীর সোজা অথচ শক্ত ফুলের ডগা কেটে নিয়ে এল কতো। বছরের ফুলঝাড়ু হয়ে যাবে ওতে। অনেকে হয়ত ঝাড়ু বেঁধে হাটে বিক্রীও করবে কিছু কিছু। পাতলি থাকলে সেও আনতে পারত।

অকালে যে রকম থমথমে কালো মেঘ মনে হয় বৃষ্টি হবে খুব। ধানের পক্ষে বড় ভাল জো। তিন বিঘে জমিতে ধান। কমসে কম বিশ পঁচিশ মণ ধান পাওয়া যেত। উঃ ভাবতে পারছি না। সব গেল পাতলির একটা ভুলে। কত বারণ করলাম কিছুতেই শুনলে না। তেজী বাপের জেদী মেয়ে।

ঝপ করে কি যেন একটা পড়ল খড়ের দেওয়ালে। মনে

হলো কারো হাতের মৃদু থাবা। চমকে উঠল থুলে। আঁধারেই চারিদিকে টালুমালু তাকালে। কিছুই দেখতে পেল না। ধড়মড়িয়ে উঠল বিছানা থেকে। ভুল ভেঙ্গে গেল। ডেকে উঠল একটা ঝিঁঝিঁ-পোকা। অবিরাম ডেকে চলেছে। উঃ কি কর্কশ, গগনভেদী স্বর! বিশ্বের সমস্ত সাড়া শব্দ যেন তলিয়ে গেছে এতে। এক্ষুণি ছেলেগুলো উঠে পড়বে। যন্ত্রণার পরে যন্ত্রণা বাড়বে। উঠে গিয়ে পোকাটিকে সাবাড় করলে। আবার এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি এল আকাশ ভেঙ্গে। ঠাণ্ডা হলো দেহ। মুহূর্তে মনের কোণে জেগে উঠল সকালের সেই মর্মান্তিক দৃশ্য। তেমাথায় বট গাছের তলায় জমেছিল লোকের কী অস্বাভাবিক ভীড়! সকলেরই যুদ্ধং দেহি ভাব! একদল লোক কাজে যেতে চাচ্ছে। আর একদল দিচ্ছে বাঁধা। পুলিশ দাঁড়িয়ে সেখানে। তারা শান্তি প্রার্থনা করছে। কে শোনে তাদের কথা? লাফিয়ে পড়ল ধর্মঘটীর দল। সামনে পাতলি। উঃ কী বহ্নিভরা রাগত চোখ তার! যেন স্বর্গ থেকে ভগবতী নেমে এসেছেন অসুরদলকে বধ করতে। হাতে তার একটা ঝাড়ু। কাকুতি, মিনতি সব ব্যর্থ হল যখন সুরু করল ঝাঁড়ুর ব্যবহার, তখন। কাছেই পুলিশের লরী। হাতকড়ি লাগিয়ে উঠালো তাকে লরীতে। বেলা তখন ন'টা। রোদ খাঁ খাঁ করছে। চেয়ে দেখলাম তাতে সে একটুও বিবর্ণ হয় নি। সুন্দর নিটোল গৌর দেহে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। মনে হলো সারা অঙ্গে কে যেন গর্জন তেল মাখিয়ে দিয়েছে। তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে। হঠাৎ জনতার আর্তনাদে জটলা ভাঙ্গল। দেখলাম—আইধোঙ্গের বউ তুলিমায়া পড়ে

আছে মাটিতে হাত দুটি পেটের ওপর রেখে। মুখে অসহ্য বেদনার ছাপ। ডাক্তার এসে নিয়ে গেল হাসপাতালে। পাতলি রাগে গজগজ করছে। চোখে মুখে ছুটছে গরম খৈ। সে বলে চলেছে—আমরা চললাম জেলে। যারা রইল সমান তালে চালিয়ে যেও আন্দোলন। চা গাছের মূলে এ বাতাস ছড়িয়ে দাও। সারা জগৎ জানুক আমরাও মানুষ।

বৃষ্টির বিরাম নেই। শো শো টুপ টুপ শব্দ হচ্ছে। কে যেন জোরে ধাক্কা দিলে দরজায়। মনটা খুশিতে ভরে গেল। ভাবলাম—এমন কি অন্যায় করেছে যার জন্য জেল হবে? ছেড়ে দিয়েছে তা হলে? উঠে বাতিটা জ্বাললাম। এর মধ্যে শুয়োরের গোঁদ গোঁদ শব্দ এলো কানে। ভুল ভেঙ্গে গেল। তবুও সংশয় রইল মনে। দরজা খুলে দেখি বড় মর্দা শুয়োরটা সারা উঠানটা চষে বেড়াচ্ছে। আবার ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভাবছি—খুব সকালে উঠতে হবে। বসে বসে কেবল ভাবলে তো চলবে না। তিনটি ছেলে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ঘুমুতে চেষ্টা করছি। এর ভেতর বৃষ্টি থেমে গেছে। মুরগি ডেকে উঠল বিকট আওয়াজ করে। তবে কি ভোর হয়েছে? এইটুক্ষণ-পরেই কানে এল রাস্তার জলের কলের শব্দ। বাইরে এসে আম গাছের সঙ্গে বাঁধলাম গরুটাকে। কলসী করে জল আনলাম কল থেকে। ছেলেমেয়েরা তখনো ঘুমিয়ে। চুলো জালিয়ে ভাত চড়িয়ে ভাবছি—বেশ ছিলাম আমরা।

আমাদের কোন অভাবই ছিল না। কি দরকার ছিল বোনাসের? সারা দিন দু'জনে কাজ করতাম। তারপর সন্ধ্যায় মুখোমুখি বসে গল্প করতাম। দিনের সব ক্লান্তি অবসাদ কেটে যেত। এ কি? কিসের গন্ধ আসছে নাকে? ভাতের হাঁড়ির দিকে নজর পড়তেই দেখি—জল শুকিয়ে তাতে লেগেছে। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়েছি। বেশ বেলা হয়েছে তখন। আকাশে মেঘের লেশ নেই। সারা বাড়ি রোদে চক চক করছে। কানে এলো একটা আনন্দোল্লাস। বাইরে এসে দেখি—প্রায় একশো লোক আসছে। তাদের মধ্যে পাতলি। মুখখানা শুকিয়ে গেছে তার তবু চোখে মুখে যেন একটা বিজয়ের ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে। এগিয়ে গেলুম একটু।

বললে—কাল নিশ্চয়ই তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল? ভয়ের কিছু ছিল না। আমরা তো কোন মারপিট বা জুলুম করিনি। তবে জান কি বড় কাজ কিছু করতে গেলে ঝোঁকের মাথায় একটু আধটু অন্যায় হয়। এই বলেই ঘরে ঢুকে ছেলেমেয়ে ক'টিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আদর করতে লাগল। তারপর আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে—এত বেলা হয়েছে এদেরকে তবু ওঠাও নি। মা না থাকলে বুঝি এমনি হয়?

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে একটু হাসলাম।

রাস

চাঁদ নেই। তারারা নিখোঁজ। বর্ষণমুখর আকাশে শুধু কালো মেঘের বিষণ্ণ স্তব্ধতা।

শ্রাবণের মাঝামাঝি। অঢেল পাতি আসছে বাগান থেকে। বাগানের গুদোমে চা তৈরী হচ্ছে। শুধু কলকব্জার একঘেয়ে অশ্রান্ত ঘর্ঘর শব্দ। এ শব্দে আর সব কিছু তলিয়ে গেছে। যৌবনপ্রমত্তা তোরষার ডাকও শোনা যায় না।

কারখানার সদর ফটকের মুখোমুখি, একটু তফাতে কণাদের বাড়ি। বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম নেই শুধু কণার। নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছে, জানালা ঘেঁষে। বাঁশি শুনছিল। একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত বাঁশি বাজছিল গুদোমে। এবার থেমে গেছে। রোজই এমনি বাজে। বাজায় সুবল। পীতাম্বরদের বাসে চাকরি করে সে। ড্রাইভার। সকাল ছটায় যায় আলিপুরদুয়ার; ফেরে বিকেল পাঁচটায়। এসে হাত মুখ ধুয়ে সুখদা হোটেলে নাকে-মুখে দু'টো কিছু গুঁজে নরম গুদোমে গিয়ে বাঁশি বাজায় রাত এগারোটা পর্যন্ত। পাগল!

কণার খুব ভাল লাগে সুবলের বাঁশির সুর। মনটাতে কেমন যেন একটা আরামের ছোঁয়া লাগে। খোলা জানালা দিয়ে দু' এক ঝাঁক হাল্‌কা বাতাস ঢুকে লুটোপুটি খায় তার কাপড় জামায়। আঁচলটা অযথা একটু এদিক ওদিক

করে কণা। সোজা জানালা দিয়ে অন্ধকার নরম গুদোমের দিকে অপলক চেয়ে চেয়ে কত কি যে ভাবে!

দরজাটা ভেজানো ছিল। খিল বন্ধ ছিল না ভেতর থেকে। অন্ধকারে চেয়ে চেয়ে কি-জানি একটা দুরূহ কথাই ভাবছিল কণা! বিদ্‌ঘুটে একটা অঙ্কের সমস্যা তো লেগেই আছে তার, মনের অক্লান্ত চিন্তা ও সাধনাতেও উত্তর মেলাতে পারে না যার। কবে যে এর সমাধান হবে ভগবানই জানেন!

সুবলকে কি ভালবাসে কণা? না। তবু সুবলের বাঁশির সুর সত্যিই বড় ভাল লাগে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে তাতে। সবভোলার দেশে নিয়ে গিয়ে শুধু একটি সুরে লয় করে দেয়! তোরষা নদীর নীল-জলের চটুল ঢেউগুলো যেন আবার বুকে এসে লাগে তার। বুকটা কেমন যেন কল-কল করে ওঠে। তন্ময় হয়ে অনেক কথাই ভাবে কণা। নিরিবিলি এই রাত্রে ঘরে এসে বসলেই চিন্তার বোঝা এসে মাথা ভার করে দেয়, মন ও দেহটাকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে। এইসব দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পেতেই যেন সুবলের ঐ বাঁশের বাঁশিটা।

প্রথম কয়েকটা দিন অবশ্য সুরটা কেমন বেসুরো তালকাটা লেগেছিল। মনে হ'তো—ভরা-দুপুরের খরখরে করকরে রোদে একটা কদর্য ভোঁতা শব্দ উঠেছে। বিক্ষিপ্ত মনটা আরো ছিন্ন-ভিন্ন হত। কিন্তু একদিন সুরের ডাকটা পালটে গেল।

এরপর বিকেলে সুবলের লরীর হর্ন শুনলেই কেমন যেন চমকে উঠেছে কণা। জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনোদিন বা বাইরে।

মাঝে মধ্যে বাইরে যেতে হয় কণাকে। বিকেলের দিকে। ফেরার পথে সুবলের গাড়ির শব্দে চোখাচোখি। সুবলের সঙ্গে।

ধুলো বালি উড়িয়ে চলে যায় লরী। পাহাড়ী পাথর মিশেল ধুলোবালি—ওদের কাপড়-জামায়, চোখেমুখে ও চুলে লাগে। সুবল হাসে। গড়ির দু'চারজন প্যাসেঞ্জারও গলা বাড়ায়। খনা বিরক্ত হয়ে কাপড়-জামা ঝাড়ে আর থু থু করে থুথু ফেলে বার বার। বিষমাখা চোখে তাকায়, তিক্ত স্বরে গজগজ করে গাল দেয় ড্রাইভারকে। পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখ! আমাদের দেখতে পেলে যেন আরো জোরে চালায়। কসরতি দেখাবার আর জায়গা পায় না! আর তোরও দোষ আছে দিদি, এই রাস্তা না হলে আর তোর বেড়ানো হয় না।

কণা মুচকি হেসে গাড়িটার দিকে তাকায় এক ফাঁকে। গাড়িটার সেই ছুটন্ত ভাব যেন আপনা থেকেই কমে গেছে।

কণার বড় ভাল লাগে এই ধুলোবালি। এ যেন ফাগের রঙ। তার স্পর্শকাতর মনকে স্পর্শ করে। একটা সূক্ষ্মতম মুহূর্তেই বাঁশির মনকাড়া সুর অনুরণন দিয়ে ওঠে মনে। কেমন করে যেন মনে পড়ে রাসলীলা। সামনেই রাসের মেলা। অনেকদিন আগে একবার এই রাসের মেলায় আশ্চর্য সুন্দর বাঁশি বাজানো শুনেছিল কণা। সে-কথা আজও ভুলতে পারে নি।

বাস দূরে চলে যায়। চোখ রগড়ায় কণা। লাল হয়ে ওঠে চোখ। মুখ মোছে আঁচলে। গৌর মুখখানাও লাল হয়ে ওঠে।

আজ অন্ধকারে, এত রাত্রে জানালায় বসে নিজেকে বড় নিঃস্ব ও নিঃসহায় মনে করছে কণা। তার এই পাওয়ায় যেন একটা মুহূর্ত কোন অসীম শূন্যে হারিয়ে গেল। বসে বসে কতো কি ভাবছে। পুরনো ক্ষতে কে যেন আবার করে খুঁচিয়ে দিল।

মনে পড়ছে সুশীলকে। রোজই পড়ে। বাঁশি যত ভাললাগতে চায়—সুশীলকে তত বেশী মনে পড়ে।

বাগানের বাগানবাবুর মেয়ে বিমলা। বিমলার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল কণার। মনের অলিগলির কত গোপন বিনিময় হতো ওদের।

সেবার পুজোয় এলো বিমলার মামাতো ভাই সুশীল। সুদর্শন চেহারা। উঠন্ত বয়সের জীবনী শক্তিতে ভরপুর। কাজ করে মিলিটারীতে। মিলিটারীতে কাজ করলেও মেজাজ কিন্তু মোটেই মিলিটারী নয় সুশীলের। বড় শান্ত মধুর মানুষ। বয়সে বিমলার চেয়ে অনেক বড়। বিমলার দাদা, তাই সে-ও দাদা বলে ডাকতো তাকে। ওরা রোজ বিকেলে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুত্ব। সুশীল আর কণার সঙ্গে হেঁটে পারতো না বিমলারা। ওরা পিছু পড়ে থাকত অনেকটা। তারা চলে যেতো কতো দূরে—একেবারে বাগানের উত্তরে যেখানটায় চায়ের চাষ শেষ হয়ে শুরু হয়েছে বাঁশবাড়ি আর রিজার্ভ ফরেস্ট। সেখানে দু'জনে নরম ঘাসের গালিচার ওপর বসতো পাশাপাশি। গল্প করত। দেশ বিদেশের কথা শোনাত সুশীল। শালগাছের পাতা নড়ত। বনে ময়ূর ডেকে উঠত। হঠাৎ যেন ওরা উদাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ত। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাত না।

অনেক কথাই মনে হয় আজ। একদিন বাগান থেকে দু'টো হরিণ ত্রস্তপদে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল সামনে। সুশীলকে ভয়ে জড়িয়ে ধরেছিল কণা। বিমলারা অনেক দূর থেকে তা দেখতে পেয়েছিল। এ নিয়ে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপও করেছে।

এক মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিল সুশীল। সমস্ত ছুটিটা কাটাল এখানে। তোরষা বাসরার তীরে বসে লাল নীল সাদা কালো নুড়ি চালিয়ে, নীলমাখা নীলজলের খেলা আর বাঁশঝাঁড় ও বনের নীরব সৌন্দর্য দেখে। বড় ভাল লাগত এ সব তার। মিলিটারী জীবনটা এই এক মাসের মধ্যেই কেমন যেন ভুলে গেল। শেষ পর্যন্ত আরো কিছুদিন ছুটি বাড়িয়ে নিল।

এখনও ফিরে ফিরে মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। সুশীলের ছুটি ফুরোবার আগে একদিন ওরা গিয়েছিল তোরষা নদীতে স্নান করতে। বনভোজনের ব্যাপারও ছিল।

জলে নেমে স্নান করছিল তারা। নীল কাচের মত স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জল। লাল নীল শাদা কালো নুড়িগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, স্রোতের তাড়ায় গড়িয়ে দুলে দুলে এ-ওর গায়ে পড়ছিল।

কণা সাঁতার জানতো না। তাকে হাতে ধরে ধরে সাঁতার শেখাচ্ছিল সুশীল। প্রথম তো ভয়ে ভয়ে কাটল—অল্প চেষ্টা করতে গিয়েই বিপদ। ডুবে গিয়েছিল আর কি! না হলে মরত সে-দিনই।

আর ভাবতে পারে না কণা। বাতিটা নিভিয়ে ক্লান্ত রুগ্ন মানুষটির মত বিছানায় শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকে। ঘুম আসে না। আকাশ-পাতাল ভাবনা। এমন যদি করবে তাহলে সেদিন স্রোতের মুখ থেকে টেনে আনল কেন?

আজ কদিন ধরেই কণা ভাবছে, একটা চিঠি লিখবে সুশীলকে। ঠিকানা সে জানে। সুশীল দিয়ে গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত কখনও কণা চিঠি লেখেনি। লিখতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু সংকোচ হত, লজ্জা বাধা দিত। সুশীলও তো কোনোদিন চিঠি দেয়নি। তবে?

এখন অন্য রকম মনে হয়। চিঠি লেখা যে খুবই দরকারী এ-ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসেছে। সুশীলের কাছ থেকে বড় জরুরী একটা কথা জানার আছে। না জানা পর্যন্ত কণা সুস্থির হতে পারছে না। সুবলের বাঁশি যে কী ভীষণভাবে হাতছানি দিচ্ছে, তা যদি বুঝত সুশীল। কণাই শুধু অনুভব করতে পারে সে-আকর্ষণ। অবাক হয়, ভাবে। কোনো কূলকিনারা পায় না।

বাগান-সর্দারের মেয়ে কণা—পুরোপুরি বাঙালীও নয়। অভ্যাসে সংস্কারে বাঙালী; কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অন্য ধরনের সরে থাকা আছে। হয়ত সুশীল এই কথা ভেবেই সরে গেছে, দুদিনের খেলা সেরে। হয়ত সুবল এই কথা ভেবেই এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আর কেউ যখন আসছে না বাগানের। বাঙালীবাবুরা চালাক খুব। অমন হাসাহাসিতে রাজী আছে। বিয়ে সাদিতে নেই। কণার বয়স হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে না।

কণাকে সত্যি করে একটা কিছু জেনে নিতেই হবে।

চিঠিই লিখবে কণা। বিমলার কাছে শুনেছে সুশীলের কুচবিহার আসার কথা এ-সময়। আর কণারা ত ক'দিন পরেই মেলা দেখতে যাচ্ছে। যদি দেখা হয় সেখানে—!

চিঠি শেষ পর্যন্ত সত্যি লিখল কণা। ছোট চিঠি, অল্প ক-টি কথা। এবারে রাস মেলায় যাচ্ছি, শুনেছি আপনি কুচবিহারে আসছেন। যদি দেখা হয়—। যদি দেখা হয়, কি হবে সে কথা কিছুই লিখতে পারল না কণা। শুধু লিখল, খুব ভাল হয় তা হলে

জবাব আশা করেছিল কণা। এই প্রথম চিঠিলেখা, অনাত্মীয় এক পুরুষকে। জবাব আসবে অনাত্মীয় পুরুষের কাছ থেকে—এ-প্রত্যাশাতেও আনন্দ ছিল। নেশা ছিল। অপেক্ষা, আর কল্পনা।

সুবলের বাঁশীও বাজছিল। থামছিল না। বরং তার সুরে যেন দিন দিন আরও উদাস, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। কণা চাইত, সুবলের বাঁশীটা বন্ধ থাক। খারাপ লাগত ভাবতে, দেড় বছরের মধ্যে তার মনের অত সুন্দর করে গড়া কূল ভেঙে আবার এক নতুন কূল গড়ে উঠবে। একে কেউ ভাল বলে না। পরিবারের কথা তুলে হয়ত বিমলাই বলবে, তোরা ত এমনই হয়ে থাকিস।

হয়ত এ-জন্যেই কণার যত অস্বস্তি যন্ত্রণা। এ-কষ্ট কাউকে বোঝাবার নয়। নিজেও যে বোঝে না কণা। তাই না এত!

চিঠি আসে না। জবাব নেই সুশীলের। প্রতিদিনের অপেক্ষা ভার হয়ে মনে বসে। মেলার দিন দূরে থাকল না। কাছে এল। তারপর এসেই পড়ল।

মেলা শুরুর পরই কণাদের যেতে হ'ল কুচবিহার।

কুচবিহার স্টেশন পর্যন্ত কি করে যে এসেছে কণা—ঠিক যেন বিকারগ্রস্থ রোগী। স্টেশন থেকে একটা সাইকেল রিকশা করবার সময় কাকে আব্ছা ভাবে দেখে যেন চমকে উঠল কণা।

দুপুরটা কাটল। কেমন যেন বেহুঁশ। বিকেলের গোড়ায় মেলা।

পথে যেতে যেতে দূর থেকেই শুনতে পেল মেলার হট্টগোল। হঠাৎ মেলার সব কল্লোল তলিয়ে গিয়ে কণার মনের অতলে ভেসে উঠল সুশীল। ও কি এসেছে? এই মেলায়? ও কি আসবে?

বৈরাগী দীঘির উত্তর পাড়ে সানবাঁধানো ঘাট। দীঘির পাড়েই রাস্তা, তারপর তার লাগোয়া মদনমোহনের বাড়ি ঢুকবার ফটক। পুকুরের এই পাড় দিয়ে রাস্তার দু'ধারে বসেছে কৃষ্ণনগর ও নানা জায়গার মেটে পুতুল আর ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলনার দোকান। দীঘির পুবদিকে রাস্তা। তার পরই মস্ত বড় একটা খোলা মাঠ। এই রাস্তার দু'ধারে আর মাঠের বুকেই বসে বড় মেলা। এখানে কাপড় জামা থেকে তামা-পিতল-কাঁসার বাসনপত্তর, সোনারূপোর গায়নাগাঁটি

হরেক রকম জিনিসই পাওয়া যায়। এরই লাগোয়া একটা যাত্রাপার্টি, ছোট বড় অনেকগুলো সার্কাস—ছোট ছোট কতকগুলো তামাশা-দেখানোওলাদের পুতুল নাচ, তাসের খেলা ও জুয়াড়ীদের জুয়ার কোর্ট।

এ সমস্ত হল্লাহল্লিতেও খেয়াল হয়নি কণার। চমক ভাঙে মামাতো বোনের কথায়। বোন বলল—চল, দোকান-পশারগুলো আর নয়—এবার ওই তামাশা—।

—না ভাই, ও-সব পরে হবে। চল্ আগে ঠাকুরবাড়ি যাই।

—ঠাকুরবাড়িতে তো আর শুধু একটা মাত্র ঠাকুর নয় যে দু'মিনিটেই প্রণাম সেরে নিতে পারবি। অগুণতি ঠাকুর এখানে। প্রণাম সারতে তোর ক-ঘণ্টা লাগবে জানিস?

—যত ঘণ্টাই লাগুক, কণা ঠাকুরবাড়িতেই যাবে। মামাতো বোন গজগজ করে। বলে, বেশ যা তুই আমি ওখানে টিকিট কিনে নি। এখানেই আবার দেখা হবে।

কণা বলল—তাই ভাল।

সারিবদ্ধ দেবদেবীর মন্দির।

হঠাৎ পিছন থেকে কে তার গায়ের পাশে নাম ধরে ডেকে ওঠে। শিউরে ওঠে কণা। লজ্জা সংকোচ ও ভয়ে মুখ তুলতে পারে না।

সুশীল এসেছে। কণা জানত সে আসবে। এমন সময়ে সে না এলে যে হয় না।

নিজেকে সামলে নিয়ে কণা মুখ তোলে একটু।

পাশের মানুষ আরও কাছে এল। আরও নীচু গলায়

ডাকল নাম ধরে। কণা কেমন একটু চমকে উঠে আস্তে ক'রে মুখ তুলল। সুশীল নয়। সুবল।

সুবল বলল, 'কথা কইছ না যে ?'

কণা কোনো কথা না বলে একবার শুধু সুবলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল। হাসল। কিন্তু তার-পরই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কণা জানত এমনই হবে। জানত—তবু শেষ পর্যন্ত কী যেন বিশ্বাস করতে চেয়েছিল।.... কণার ভাল লাগছিল এবার।

সুশীলকে সত্যিই চিঠি লিখেছিল না সুবলকেই আসতে বলেছিল—কণা আর তা মনে করতে পারল না।